দিল্লীশ্বরী

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা

দ্বিতীয় সংস্করণ

অগ্রজপ্রতিম

রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের

করকমলে

নিবেদন

'দিল্লীশ্বরী'তে দুইটি ঐতিহাসিক-চিত্র—রজিয়ৎ ও নূরজহান্ স্থান পাইয়াছে। যাহাতে ইতিহাসের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য ইতিহাসের মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়াও রচনা যথাসম্ভব সরস করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

১লা বৈশাখ ১৩৩০ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রজিয়া

রজিয়ৎ

১

সিংহাসন-প্রাপ্তির অন্তরায়; আদেশ অমান্য ও তাহার ফলাফল

মালব-বিজয়ী, অপ্রতিহত-ক্ষমতাশালী মহা ঐশ্বর্য্যবান্ দিল্লীর সুলতান্ ইয়লতিমিশের মনে এক তিলও শান্তি নাই। তাঁহার দিন সংক্ষিপ্ত, কবে কখন খোদার শেষ পরওয়ানা জারি হয়, কে বলিতে পারে? বহুদিনের সঞ্চিত অর্থ, বিপুল সম্পত্তি তিনি কাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া যান? সঞ্চয় ত তাঁহার বহু সাধারণ সঞ্চয় নহে—দিল্লীর মহামূল্য রাজসিংহাসন, হিন্দুস্থানের বিশাল সাম্রাজ্য!

এই রাজপাট ত তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন নাই,— বিপদের মহাসমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জীবন-মরণ-পণে সুলতান ইয়লতিমিশ্ ইহার অধিকারী হইয়াছেন। তিনি সম্রাট্ কুতব্-উদ্দীনের জামাতা মাত্র। কুতবের কাল হইলে (১২১০-১১) তাঁহার এক অযোগ্য পুত্র—ইয়লতিমিশের শ্যালক—অল্প দিনের জন্য রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। ইয়লতিমিশ্ এই দুর্ব্বল ও

বিলাসীর হাত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া, বাহুবলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া, সাম্রাজ্যের গৌরববৃদ্ধি ও সম্রাট্-পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। এই স্বোপার্জ্জিত, স্বরক্ষিত রাজ্যের প্রতি তাঁহার যে মমত্ববোধ কতখানি, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। কিন্তু বার্দ্ধক্যে দিন দিন দেহ ক্ষীণ ও বাহু হীনবল হইয়া পড়িতেছে; এক দিন তাঁহার শিথিল হস্ত হইতে,—ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক,—শাসনরশ্মি স্খলিত হইয়া পড়িবেই পড়িবে। তখন তাঁহার এত সাধের এই রাজ্যের দশা কি হইবে?

উপযুক্ত পুত্র থাকিলে মানুষ তাহার হাতে সমস্ত সমর্পণ করিয়া শেষ বিদায়কালে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িতে পারে, সন্দেহ নাই। সুলতান ইয়লতিমিশেরও পুত্র আছে; একাধিক পুত্র। কিন্তু তাহাদের কাহারও উপর নির্ভর করিবার উপায় নাই। তাহারা সবাই বিলাসী, অকর্ম্মণ্য—রাজ্যভার গ্রহণের অনুপযুক্ত।

আরও দুশ্চিন্তার কথা এই যে, তখনও হিন্দুস্থানে মুসলমান-রাজ্যের বনিয়াদ পাকা হইয়া বসে নাই—সূচনা মাত্র। হিন্দু রাজতক্ত ও রাজচক্রবর্ত্তিত্ব হারাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার নিপীড়িত বাহুবল নির্ম্মূল হইয়া যায় নাই। তাহাদের নির্যাতিত শৌর্য্য-বীর্য্য দিকে দিকে বিক্ষিপ্ত ও স্তম্ভিত হইয়া আছে। তাহার পর মুসলমানেরাও যে সকলেই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ তাহা নহে—তাহাদের মধ্যে বিষম গৃহবিবাদ, জাতিগত ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতিঘাত, হিংসা-দ্বেষ। ভারতে রাজন্যপদে প্রতিষ্ঠিত তুর্কীরা সমষ্টিবদ্ধ নহে; সকলে নিজ নিজ প্রাধান্য-প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর। কেহ কাহারও

প্রভুত্ব স্বীকার করিতে রাজি নয়। সুযোগ সুবিধা পাইলে তাহাদের যে-কেহ যে-কোন মুহূর্ত্তে তল্‌ওয়ারের ঘায় রাজার মাথা উড়াইয়া দিয়া, রাজছত্র টানিয়া লইয়া, রাজসিংহাসন জুড়িয়া বসে। এক কথায়, বিপ্লব ও বিদ্রোহ, অশান্তি ও অত্যাচারের তাণ্ডব-নৃত্যে রাজতক্ত তখন সর্ব্বদাই টল্‌টলায়মান।

কিন্তু চিন্তাকুল বৃদ্ধ বহুদর্শী সুলতান মাঝে মাঝে অবাক্ হইয়া দেখেন, প্রাণাধিক স্নেহের পুত্তলী রজিয়ৎ* কন্যা বটে, কিন্তু পুত্রাধিক। কোন্ স্বর্গীয় প্রতিভার অধিকারিণী হইয়া সে তাঁহার ঘর আলো করিতে আসিয়াছে, কে বলিবে? যে বিচার-বুদ্ধি প্রবীণের নাই, যে ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা বীরের মধ্যে নাই, তাহা তাঁহার এই স্নেহরূপিণী কন্যায় আছে—প্রচুর পরিমাণে। আচারে-ব্যবহারে, কথায়-কার্য্যে প্রতি দিন তাহা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। সুলতান ইয়লতিমিশ্ তাহার উপর গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া দেখিয়াছেন, সে ভার সে অবলীলাক্রমে বহন করিয়াছে। রজিয়তের প্রতিভাদীপ্ত অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অন্ত নাই। রজিয়ৎ—তাঁহারই স্নেহের পুত্তলী রজিয়ৎ—কুসুম হইতেও কোমল, আবার বুঝি বজ্র হইতেও কঠোর! তাহাকে সিংহাসনে বসাইতে আপত্তি কি?

সুলতান তাঁহার সঙ্কল্প অবশেষে এক দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন,

---

* রজিয়ৎ "রাজিয়া" বা "রিজিয়া" নামে, এবং ইয়লতিমিশ "আলতামাশ" নামে বঙ্গসাহিত্যে পরিচিত।

—মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে গোয়ালিয়রের যুদ্ধ জয় করিবার প
রজিয়ৎকেই তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী নির্দ্দেশ করিয়
সভাসদ্‌গণকে একটি সনদ্ লিখিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘোরতর আপত্তি উঠিল—এ যে নিতান্ত
অসম্ভব, অশোভন প্রস্তাব। যাহা পুরাণে নাই, কোরাণে নাই—
যাহা মুসলমান-ধর্ম্মশাস্ত্রের একান্ত বিরোধী, তাহার সমর্থন তাঁহার
কিরূপে করিবেন? সকলে একবাক্যে বলিলেন,—'সুলতানে
পুত্রেরাই ত এখন সাবালক—রাজদণ্ড-ধারণের উপযুক্ত
তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কন্যাকে সিংহাসন দান করা কিছুতে
যুক্তিসঙ্গত হইবে না।'

সুলতান ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, 'পুত্রেরা যে সাবালক, তাহাতে
সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারা উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসব্যসনে নিমগ্ন
রাজ্যের শাসন-রশ্মি সংযত রাখিতে পারে, এমন ক্ষমতা তাহাদে
কাহারও নাই। সে ক্ষমতা আছে—আমার এই কন্যারত্নের
এখন তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে না; পারিবে এক দিন—যেদিন
আমি ইহলোক হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিব। সেদিন বুঝিবে
রাজ্যশাসন-ব্যাপারে আমার কন্যাটির কত বড় যোগ্যতা—আমা
সন্তানগণের মধ্যে একমাত্র সে-ই সিংহাসনে বসিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত
পাত্রী কি না।'*

---

* The Sultan replied: "My sons are engrossed in th
pleasures of youth, and none of them possesses the capabilit
of managing the affairs of the country, and by them th

সুলতানের অনুরোধ অরণ্যে রোদনে পরিণত হইল। মন্ত্রীরা মনে করিলেন, তাঁহার মতিভ্রংশ হইয়াছে—কন্যার প্রতি অতিরিক্ত স্নেহই তাঁহার এইরূপ অসঙ্গত ইচ্ছার হেতু। যে-রাজ্যে ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর—ঘরে ষড়যন্ত্র, বাহিরে বিপ্লব-বিদ্রোহ,—যেখানে পুরুষোচিত বলবীর্য্য ও বিচক্ষণতা না হইলে এক পাও অগ্রসর হইবার যো নাই, সেখানে একজন অবলা কুসুমকোমলা নারীর নির্ব্বাচন কি সর্ব্বাংশেই প্রহসনের মত হাস্যকর নহে ?

ইয়লতিমিশের মৃত্যুর পর আমীর-মালিকগণ বিশেষ সত্বরতার সহিত যুবরাজ রুকন্-উদ্দীন্ ফিরুজ শাহ্‌কেই সিংহাসনে বসাইলেন এবং বোধ হয়, মনে মনে নিজ জ্ঞান-বুদ্ধির তারিফ করিয়া গর্ব্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, কিছু দিন অতীত হইতে না হইতেই তাঁহারা নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিলেন ; বুঝিলেন, দূরদর্শিতায় স্বর্গীয় সুলতানের কাছে তাঁহারা বালকমাত্র !

যুবরাজ রুকন্-উদ্দীনের রাজকার্য্য দেখিবার অবসর কোথায় ? পিতার বর্ত্তমানে তাঁহার যে ভোগবিলাসের স্রোত নিরুদ্ধপ্রায় ছিল, তাহা এখন ভীষণ উদ্দাম হইয়া উঠিল ; কোষাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তিনি বিলাসের খর স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। নারকীয় কুক্কুরগণের আর আনন্দের অবধি ছিল না।

সুরাপানে প্রমত্ত সুলতান হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সাড়ম্বরে

---

government of the kingdom will not be carried out. After my death it will be seen that not one of them will be found to be more worthy of the heir-apparentship than she, my daugher." Minhaj-ud-din : *Tabakat-i-Nasiri* (tr. by Major H. G. Raverty), i. 639.

বাজারের মধ্য দিয়া গমন করিতেছেন—মুক্তহস্তে টাকা-মোহর বৃষ্টি করিতে করিতে! তাঁহার এইরূপ আরও যে কত খোশখেয়াল ছিল, বলিয়া শেষ করা যায় না। কুসঙ্গীদের মহাসুযোগ উপস্থিত হইল। তাহারা রুকন্-উদ্দীন্‌কে নানারূপ বিলাসের আবর্ত্তে ডুবাইয়া-মজাইয়া মনের সুখে রাজভাণ্ডার লুঠিয়া লইতে লাগিল।

রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন—রুকন্-উদ্দীনের গর্ভধারিণী, শাহ্ তুর্কান্ নামে এক তুর্কী কৃতদাসী। তাঁহার মেজাজ যেমন কড়া, স্বভাব তেমনই নিষ্ঠুর। এই উগ্রচণ্ডা রমণী নিজের ও পুত্রের সুখের পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য অচিরাৎ মৃত সুলতানের অন্যান্য বেগম—তাঁহার সতীনগণকে নিহত করিলেন।

মাতা ও পুত্রের রাজ্য-শাসনের এইরূপ ভীষণ নমুনা দেখিয়া আমীর-মালিকগণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন; বুঝিলেন, কি জন্য বৃদ্ধ সম্রাট্ পুত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার আদরিণী কন্যাকে সিংহাসনে বসাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; আর সেই আদেশ অমান্য করিয়া তাঁহারা কি অন্যায় অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই শেষ নহে,—তাঁহাদের অনুশোচনা ষোল কলা পূর্ণ হইতে তখনও অনেক বাকি।

দেখিতে দেখিতে ইয়লতিমিশের অন্যতম পুত্র কুমার কুতব্-উদ্দীনের চক্ষু উৎপাটিত হইল। জনসাধারণ ক্ষুব্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া এত দিন মাতা ও পুত্রের অত্যাচার ও অনাচারের পৈশাচিক লীলা দেখিতেছিল; কিন্তু এবার তাহাদের ধৈর্য্যের বাঁধ অটুট রাখা শক্ত হইয়া উঠিল। বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত মালিকগণের

অসন্তোষ-বহ্নিতেও ইন্ধন সংযুক্ত হইল। তাঁহারা বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইবার সঙ্কল্প করিলেন।

চতুর্দ্দিকেই অশান্তির, রাজদ্রোহের অগ্নি প্রধূমিত; ইতিমধ্যে রাক্ষসী শাহ্ তুর্কানের রক্তচক্ষু রজিয়তের উপর পতিত হইল। এই সতীন-কন্যাই যে তাঁহাদের অভীষ্ট পথের প্রবল অন্তরায়, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিনা-বাধায় নৃশংস ব্যবহার করিয়া শাহ্ তুর্কানের দুঃসাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি প্রকাশ্যভাবেই রজিয়তের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার হত্যার জন্য ষড়্যন্ত্র পাকাইয়া তুলিলেন। লোকচিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; রাজকুমারীর প্রতি অকারণ অত্যাচারে তাহাদের ক্রোধাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল;—তাহারা ভীম-পরাক্রমে রাজদুর্গ* আক্রমণ করিয়া শাহ্ তুর্কান্‌কে বন্দী করিল। স্নেহের দুলাল রুকন্-উদ্দীন্ তখন আর রাজধানীতে উপস্থিত নাই,—পঞ্চনদ প্রদেশে বিদ্রোহীরা বিশেষ গোলযোগের আয়োজন করায়, কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে একবার সেখানে যাইতে হইয়াছিল। অতএব তুর্কান্ উদ্ধারের আর উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না; তাঁহার দীর্ঘকালের সযত্নপোষিত রাক্ষসীবৃত্তি নিষ্ফল আক্রোশে কারাগারের দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

---

* কুতব-মীনারের সন্নিকটে রায় পিথোরা-(পৃথ্বিরাজ) প্রতিষ্ঠিত দুর্গে ইয়লতিমিশ্ বাস করিতেন। আজিও এই দুর্গ-প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইখানেই সুলতানের রাজধানী অবস্থিত ছিল।

২

সিংহাসনপ্রাপ্তি ও রাজ্যশাসন

এত দিনে বৃদ্ধ সম্রাটের শুভ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইল—তুর্কী-প্রধানগণ রজিয়ৎকে রাজসিংহাসনে বসাইলেন।* কিন্তু তাহার পূর্ব্বে রাজ্যে যে অমঙ্গল—যে অনর্থপাত ঘটিয়া গেল, তাহার প্রতিকার আর কিছুতেই হইবার নহে। বৃদ্ধ সম্রাট্ হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পরলোকের পথে প্রস্থান করিলে, অত্যাচারে অবিচারে নরহত্যায় রাজসিংহাসন কলঙ্কিত এবং প্রজাবর্গ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

ক্রূরপ্রকৃতি তুর্কানের রুদ্ররোষ ও ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সিংহাসন লাভ করিতে যে রজিয়ৎকে অসামান্য বুদ্ধি-চাতুর্য্য ও সাহসের পরিচয় দিতে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সিংহাসন তখন সুখাসন নহে—বিঘ্ন বিপদ্ ও অশান্তির অনলকুণ্ড-বিশেষ। ইহাকে নিরাপদ্ ও শান্তিময়

---

* সিংহাসন-আরোহণকালে রজিয়ৎ বালিকা বা কিশোরী ছিলেন না—প্রাপ্তবয়স্কা। ইয়লতিমিশ্ কন্যাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী করিবার প্রস্তাব করিলে, তাহার প্রতিবাদে সভাসদ্‌গণ সম্রাট্-পুত্রেরা উপযুক্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। রজিয়ৎ সম্রাটের প্রথম সন্তান; সুতরাং তিনি যে বয়সে ভ্রাতাদের অপেক্ষা বড়, তাহাতে সন্দেহ নাই। সিংহাসনপ্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স যে অন্যূন ২৫, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

করিয়া তুলিবার জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োগ করিলেন।

রুকন্-উদ্দীন্ ফিরুজ সৈন্য-সামন্ত লইয়া পঞ্জাবের কুহ্ রাম নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। মাতা ও ভগিনীর বিবাদের কথা শুনিবামাত্রই তিনি ব্যস্ততার সহিত দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রজিয়ৎও ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। রুকন্ কেলুখেড়ো* পৌঁছিলে রজিয়ৎ-প্রেরিত সৈন্যদলের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হইল। ফলে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। রুকন্-উদ্দীন্ ছয় মাস ছাব্বিশ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারেই তাঁহার বিফল রাজ্যাভিনয় ও বিলাস-লীলার অকাল-সমাধি হয়।

রজিয়ৎ এইরূপে বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু স্থির হইয়া সিংহাসনে বসিতে পারিলেন না। শীঘ্রই তাঁহাকে এক নূতন বিপদ্—এক ভীষণ সঙ্কটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। উজীর নিজাম্-উল্-মুল্ক জুনেদী তাঁহার শত্রু, তিনি রজিয়তের সিংহাসনলাভে অসন্তুষ্ট—

* বর্ত্তমান দিল্লীর দক্ষিণে যমুনাতীরে মুইজ্-উদ্দীন্ কইকুবাদ (১২৮৬-৮৮) নির্ম্মিত প্রাসাদ-স্থলেই খুব সম্ভব কেলুখেড়ো অবস্থিত ছিল। (H. M. Elliot, *Bibliographical Index*, p. 284; *Ain*, ii. 279.) 'আইনে' প্রকাশ, হুমায়ুনের সমাধি এই স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু কেলুখেড়ী গ্রাম সমাধির প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত।

রমণীর প্রভুত্বের নিকট মাথা নত করিতে অনিচ্ছুক। রজিয়তের হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইবার জন্য তাঁহার যত্ন ও চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি হইল না। তিনি নিকটের বন্ধুবান্ধবগণকে কুপরামর্শ দিতে লাগিলেন, দূরবর্ত্তী রাজকর্ম্মচারিগণকে গোপনে পত্র লিখিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। দেখিতে দেখিতে বিভিন্ন প্রদেশের মালিকগণ—সইফ্-উদ্দীন্ কুজী, ইজ্জ্-উদ্দীন্ সালারী, ইজ্জ্-উদ্দীন্ কবীর খান্-ই-আয়াজ্ প্রভৃতির সহিত যোগদান করিয়া দিল্লীতে একটা ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত করিলেন।

রজিয়ৎ অল্প দিন হইল রাজ্যলাভ করিয়াছেন; প্রবীণ উজীর-পক্ষের সুবিপুল সম্মিলিত বাহিনীর সহিত যুঝিয়া উঠিতে পারেন, এরূপ শক্তি তখনও তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি বিশেষ চিন্তিত হইলেন সত্য, কিন্তু কিছুমাত্র ভীত বা উদ্বিগ্ন হইলেন না। বাহির হইতে উপযুক্ত সাহায্যের প্রয়োজন; বিশেষ চিন্তা করিয়া রজিয়ৎ অযোধ্যার সামন্তরাজ মালিক নসীর-উদ্দীনের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। নসীর তাঁহার কাছে উপকৃত—ফিরুজের রাজত্বকালে রজিয়তের অনুগ্রহেই তিনি অযোধ্যার সামন্তরাজ হইয়াছিলেন। নসীর যদিও এক্ষণে অসুস্থ, কিন্তু এই দুঃসময়ে সম্রাজ্ঞীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার ন্যায়পরায়ণ কৃতজ্ঞ-হৃদয় সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিল না; তিনি অবিলম্বে সৈন্য-সামন্ত সহ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু নিয়তির গতি রোধ করিবার নহে—সামন্তরাজ অসি-হস্তে সমরাঙ্গণে অবতরণ করিতে

পারিলেন না। গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবামাত্র শত্রুপক্ষের অতর্কিত আক্রমণে তাঁহাকে পরাস্ত হইয়া বন্দী হইতে হইল। তার পর অপটু অসুস্থ দেহ লইয়া তিনি আর অধিক ক্ষণ শত্রুর বন্ধন-দশা ভোগ করেন নাই; জগতে কৃতজ্ঞতার ঋণ কেমন করিয়া কড়াক্রান্তিতে পরিশোধ করিতে হয়, তাহার সকরুণ কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাখিয়া বাধা-বন্ধনহীন আনন্দলোকে প্রস্থান করিলেন।

রজিয়তের উদ্ধারের আশা সুদূরপরাহত—দিন দিন তাঁহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। শত্রুর আস্ফালন ও সিংহনাদের অন্ত নাই। সৈন্য-পরিবেষ্টিত অবরুদ্ধপ্রায় পুরীতে বসিয়া সম্রাজ্ঞী উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভয়ার্ত্ত শৃগালীর মত বিবরের মধ্যে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকা সিংহীর পক্ষে নিতান্ত অসহ্য। হয় মুক্তি, না হয় মৃত্যু—নান্যঃ পন্থাঃ। রণসাজে সজ্জিত বীরাঙ্গনা সদলবলে সেনা-তরঙ্গের মধ্যে সদম্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং সকলকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করিয়া বিদ্যুদ্‌গতিতে যমুনাতীরে উপনীত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কেহ তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিল না।

এইবার হাওয়ার গতি ধীরে ধীরে ফিরিতে লাগিল। উজীরের প্ররোচনায় বিদেশাগত যে-সকল তুর্কী আমীর রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে দরবারের মালিকগণের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়াছিল; ক্রমে ব্যাপার এত দূর গুরুতর হইয়া উঠিল যে, মালিক ইজ্জ্-উদ্দীন্ কবীর খাঁ ও মালিক ইজ্জ্-

উদ্দীন্ সান্‌দারী উজীরের পক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক গোপনে রাজ্ঞীর সহিত যোগদান করিলেন। দিল্লীশ্বরী রজিয়ৎ একাই এক সহস্র। মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া তিনি যে কি অঘটন ঘটাইতে পারেন, শত্রু-মিত্র সকলেই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ইহার উপরে একজন নহে, দুই দুই জন ক্ষমতাপন্ন মালিক সদলবলে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন! উজীর-পক্ষ হঠাৎ দেখিল, বিপদ্ অতি ভীষণ এবং আসন্ন। রাজ্ঞীর বলবৃদ্ধির সংবাদ-প্রাপ্তিমাত্র বিদ্রোহীরা বিচ্ছিন্ন হইয়া কে কোন্ দিকে পলায়ন করিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহাদের এই ভীতি-বিহ্বল বিশৃঙ্খল অবস্থায় রাজ্ঞীর অশ্বারোহী সৈন্যেরা কৃতান্তের মত তাহাদের মধ্যে পড়িয়া তাহাদের বিদ্রোহ-বাসনা নির্ম্মূল করিতে লাগিল। স্বয়ং উজীর নিজাম্-উল্-মুল্ক সরমূর-বর্দ্দারের পার্ব্বত্য-প্রদেশে আত্মগোপন করিয়া শির রক্ষা করিলেন। বিদ্রোহের বিপুল সমারোহ—বর্শা, বল্লম্ এবং তল্‌ওয়ারের ঘায় এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া গেল।

উপস্থিত বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া রজিয়ৎ রা[illegible]সন সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজ্যের অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়। সিংহাসনে রাজপরিবর্ত্তনের রোমহর্ষণ অভিনয় চলিয়াছে। দিল্লীর সুলতানগণের কেহই পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে রাজত্ব করিয়া রাজ্যমধ্যে প্রভুত্ব-বিস্তারের সুযোগ পাইতেছেন না প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাও যে দিল্লীর সিংহাসনের মর্য্যাদা রাখিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন—তাঁহাদের মনের গতি এমন নহে।

সুযোগ পাইলেই অনেকে রাজভক্তির মুখোস খুলিয়া নিজ মূর্ত্তি ধারণ করেন,—ইহার পরিচয় আমরা বিশিষ্টরূপেই পাইয়াছি। এরূপ ক্ষেত্রে যে রাজ্য জুড়িয়া অশান্তি ও অসন্তোষের তীব্র হাওয়া বহিবে—আশ্চর্য্য কি? রজিয়তের পিতা ইয়লতিমিশের প্রাণপণ চেষ্টায় যে এই শোচনীয় অবস্থার কতকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ফিরুজের কুশাসনে দেশের সেই পূর্ব্বভাব আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। অতএব এই উচ্ছৃঙ্খল, অশান্তিময় রাজ্যে শান্তি স্থাপনার জন্য সম্রাজ্ঞী রজিয়ৎকে বজ্রমুষ্টিতে শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিতে হইল। শাসন-তন্ত্রের আমূল সংস্কার হইল। পুরাতন অনুপযুক্ত কর্ম্মচারিগণের স্থলে উপযুক্ত কর্ম্মঠ ব্যক্তিরা রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। উজীরের পদ পাইলেন—পূর্ব্বতন উজীর নিজাম্-উল্-মুল্কের সহকারী খাজা মুহজ্জব্। কবীর খান্-ই-আয়াজের উপর বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ লাহোরের শাসনভার অর্পিত হইল।

কিন্তু এইখানেই রাজ্ঞীর কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায় নাই। তিনি ভাল রকমই জানিতেন যে, চতুর্দ্দিকের সুব্যবস্থা করিলেই কোন কার্য্যের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না;—তাহার জন্য কর্তৃপুরুষকে রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে বসিয়া সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হয়। শিরে তাজ, অঙ্গে রাজাভরণ, পায়ে জরির জুতা—সুলতানের বেশে সুলতানের মত রাজসিংহাসনে বসিয়া রজিয়ৎ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহীরা অবনতশির এবং দস্যু-তস্করেরা

তটস্থ হইল—দেশের উপর দীর্ঘকাল পরে আবার শান্তির শীতল-ছায়ার বিস্তার হইল। রাজশক্তি এখন সুদৃঢ় সুনিয়ন্ত্রিত; তাহাকে উপেক্ষা করিবার আর কোন উপায় রহিল না। বঙ্গ হইতে পঞ্চনদ—"লক্ষ্মণাবতী হইতে দাইবুল্ ও দম্‌রিলা" পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের মালিক-আমীরগণ সসম্মানে রাজ্ঞীর প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন। আনুগত্যের নিদর্শন-স্বরূপ রাজধানীতে অনেকেই বহুমূল্য উপঢৌকনাদি পাঠাইতে লাগিলেন।

দেশের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনসাধন,—অশান্তিময় উচ্ছৃঙ্খল রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়ন করিয়া, সগৌরবে ও অক্ষুণ্ণপ্রতাপে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করা কি কম ক্ষমতার পরিচায়ক? এইরূপ দুঃসময়ে রাজ্যশাসনে এরূপ কৃতিত্বলাভ ইতিহাসের যে-কোন মহাচরিত্রের পক্ষেই গৌরবের বিষয় হইতে পারিত, এ কথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিছু দিনের মধ্যে রাজ্যে আর শত্রুপক্ষের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় নাই। শম্‌স্-উদ্দীনের মৃত্যুতে সুযোগ পাইয়া হিন্দুরা রন্‌তাম্‌ভোর-দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাও তাহারা দখল করিতে পারে নাই। রজিয়ৎ যথাসময়ে সেনাধ্যক্ষ কুতব্-উদ্দীন্ হুসেন্‌কে পাঠাইয়া অবরুদ্ধ দুর্গের উদ্ধারসাধন করিলেন।

৩

বিদ্রোহ

অতি ক্ষীণ, সামান্ত কারণ—যাহাতে কোনক্রমেই সহজে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে চাহে না, চাহিলেও সে অবহেলায় আপনার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারে, আশ্চর্য্য এই, তাহার মধ্যেও মানুষের সর্ব্বনাশের বীজ, সুখের আকাশপ্রমাণ অট্টালিকা ভস্মসাৎ করিবার মত বজ্রগর্ভ অগ্নিকণা সুপ্ত হইয়া থাকে। এই স্ফুলিঙ্গের আত্মপ্রকাশে দেখিতে দেখিতে কত দেশ গিয়াছে ; কত সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইয়াছে ; কত রাজদণ্ড, কত রাজাধিরাজ, কত মহাজাতি পুড়িয়া ছাই হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রজিয়তের ভাগ্যচক্রে সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের নিষ্ঠুরলীলা আরম্ভ হইল।

জমাল্-উদ্দীন্ ইয়াকুৎ জাতিতে হাব্‌শী ; তিনি রজিয়তের অশ্বশালার পরিদর্শক—'আমীর-ই-আখুর'। রাণী ছিলেন কবির মানস-দুহিতা মণিপুর-রাজকন্যার মত :—

"অশ্বারোহী, অবহেলে বামকরে বল্গা
ধরি, দক্ষিণেতে শরাসন, নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মত, আর্ত্ত প্রজাগণে
করিছেন বরাভয় দান * * *
মুক্তলজ্জা, ভয়হীনা, প্রসন্নহাসিনী।" **—চিত্রাঙ্গদা।**

ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বস্তুতঃ রাজ্যশাসনের জন্য সর্ব্ববিষয়েই যে রমণীর পুরুষের ন্যায় হওয়া কর্ত্তব্য—এমন কি, অশনে-বসনে, গমনে-উপবেশনেও—রজিয়তের মনে এইরূপ ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই তিনি পুরুষের পরিচ্ছদ—গায়ে 'কাবা' (কোর্ত্তা), শিরে 'কুল্যা' (উঁচু টুপী), কোমরে কটিবন্ধ পরিয়া অশ্ব বা গজপৃষ্ঠে নগর-ভ্রমণে বাহির হইতেন।

বাদ্‌শাহ্‌রা সাধারণতঃ উচ্চ অশ্বে আরোহণকালে অশ্বপালের সাহায্য লইতে বাধ্য হইতেন। মহারাণী রজিয়ৎও হাব্‌শী জমাল্‌-উদ্দীন্‌ ইয়াকুতের স্কন্ধে ভর দিয়া বাদ্‌শাহী-কায়দায় অশ্বারোহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রমণী—রমণী, তাঁহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পুরুষত্বের দাবী প্রকৃতির রাজ্যে কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। এক দিন তাঁহার সেই পুরুষের ছদ্মবেশ—বাদ্‌শাহী কায়দা-কানুন পোষাক-পরিচ্ছদ আচার-ব্যবহারের অন্তর হইতে যে কেমন করিয়া তাঁহার স্বভাবকোমল স্নেহপ্রবণ রমণীহৃদয় আত্মপ্রকাশের সুযোগ লাভ করিল, তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন না। জমাল্‌-উদ্দীনের প্রতি দিন দিন তাঁহার অনুগ্রহের ভাবটা কিছু অধিক হইয়া পড়িতে লাগিল। ভৃত্যের প্রতি মনিবের অনুগ্রহের মাত্রা যতটুকু হওয়া রাজনীতির হিসাবে যুক্তিযুক্ত, রজিয়তের রমণীহৃদয় তাহাতে আদৌ পরিতৃপ্ত হইতে পারিল না। আর এক কথা, আমীর-মালিকেরা জাতিতে তুর্কী, কিন্তু জমাল্‌-উদ্দীন্‌ ছিলেন হাব্‌শী—বিজাতীয়; স্বভাবতই ইঁহার উপর তাঁহাদের একটা বিদ্বেষের ভাব ছিল। ইঁহার প্রতি রজিয়তের

অনুগ্রহের ভাব দেখিয়া, তুর্কী আমীর-মালিকেরা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না—ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

রজিয়ৎ মুসলমানগণের চিরাচরিত প্রথার মূলে ক্রমাগত কুঠারাঘাত করিতেছেন,—পর্দ্দার আড়াল ঘুচাইয়াছেন, পুরুষের বেশে রাজপথে বাহির হইতেছেন, রাজদণ্ড ধারণ করিয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন! পারিষদগণের মনে হইল, ইহা রজিয়তের অসহনীয় স্পর্দ্ধা, অতি ঘোর স্বেচ্ছাচারের পরিচয়। পুরুষ হইয়া তাঁহারা রমণীর এই সকল অনাচারের প্রশ্রয় ত কোনক্রমেই দিতে পারেন না। আরও একটা গুরুতর কথা এই—ইহাতে ধর্ম্মের অনুশাসনও অমান্য করা হয়।

মুসলমানগণের ধর্ম্মনেতা, আরবীয় প্রেরিত-পুরুষ বলিয়াছেন,—'দুনিয়ায় সতী সাধ্বী স্ত্রীলোকের মত অমূল্য সম্পদ্ আর কিছুই নাই। কিন্তু রাজসিংহাসন তাহার জন্য নহে। যাহারা স্ত্রীলোককে সিংহাসন প্রদান করে, তাহাদের মুক্তি নাই।'* অতএব রজিয়ৎকে প্রশ্রয় দেওয়ায় শুধু অন্যায়ের নহে,—অধর্ম্মেরও দাসত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। আমীর-মালিকেরা যারপরনাই

* The Arabian Prophet had said truly that 'the most precious thing in the world is a virtuous woman,...the people that makes a woman its ruler will not find salvation.' Lane-Poole, *Med. India, p.* 75.

উত্তেজিত হইয়া চারি দিকে অসন্তোষের অনল ছড়াইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, এই বিদ্রোহের আমন্ত্রণে অনেকেই উল্লাসের সহিত যোগদান করিল।

সর্ব্বপ্রথমে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইলেন—লাহোরের শাসনকর্ত্তা মালিক ইজ্জ্-উদ্দীন্ কবীর খান্-ই-আয়াজ। রাণী কিছুমাত্র ভীত বা চকিত না হইয়া সসৈন্য লাহোর অভিমুখে অভিযান করিলেন। ইজ্জ্-উদ্দীন্ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না; বশ্যতা স্বীকার করিয়া ক্ষমার্থী হইলেন। ক্ষমার্থিজনকে ক্ষমা করাই বিধি। রাজ্ঞী তাঁহাকে পদচ্যুত না করিয়া মুলতানে বদ্‌লি করিলেন। আর মুলতানের শাসনকর্ত্তা করাকুশ খাঁকে লাহোরের সামন্ত নিযুক্ত করিলেন।

এত শীঘ্র ও এত সহজে এই বিদ্রোহ-নাট্যের যবনিকাপাত হওয়ায় আমীর-মালিকগণ যে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহারা নিরাশ হইবার পাত্র নহেন,—তলে তলে একটা ভীষণ বিদ্রোহের আয়োজনে প্র[illegible] হইলেন।

তবরহিন্দার (বর্ত্তমান ভাটিণ্ডা) সামন্তরাজ ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন্ অল্‌তুনিয়া জনৈক ক্ষমতাশালী মালিক। তাঁহার সৈন্যসামন্ত ও অর্থাদির কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। রাজ্ঞীর অন্যতম পারিষদ আমীর-ই-হাজিব ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন্ এৎকীনের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ। হাজিব্ ইখ্‌তিয়ার তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া রজিয়তের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এই

সামন্তরাজ, তাঁহার বর্ত্তমান পদমানের জন্য রাজ্ঞীর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। রাজ্ঞীই তাঁহাকে জাগীর দিয়া দিল্লীর পূর্ব্বাঞ্চল বারণে (বুলন্দ্-শহ্রে) সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, আর অধুনা তাঁহারই প্রসাদে ইখ্তিয়ার তবরহিন্দার নামজাদা সামন্ত। কিন্তু সুহৃদের প্ররোচনায় তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন—নিমকের কথা বিস্মৃত হইয়া রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। রজিয়ৎও নিশ্চিন্ত নহেন, দুষ্টের দমনে উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব তাঁহার কখনই হইতে পারে না। রণসাজে সজ্জিত হইয়া তিনি অবিলম্বে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন (মে, ১২৩৯)।

পথ সুদীর্ঘ, মরুকান্তারলীন, সুদুর্গম। নিদাঘের অনলোদ্গারী দুঃসহ সূর্য্যকিরণের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে এই পথ অতিবাহনপূর্ব্বক রজিয়ৎ যখন তবরহিন্দায় উপনীত হইলেন, তখন তিনি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, পথশ্রমে অবসন্ন, সঙ্গের সেনাদলও নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ। আততায়ীরা এইরূপ একটি সুযোগের প্রতীক্ষাই এত দিন করিতেছিল। শক্তি ও সাহস, তেজ ও বীর্য্যের অবতার এই সিংহীকে বিঘোরে না ফেলিলে যে তাঁহাকে শৃঙ্খলিত করা অসম্ভব, তাহা তাহারা উত্তমরূপেই অবগত ছিল। তাই এই দুর্দ্দিনে তবরহিন্দার ন্যায় দূরবর্ত্তী দুর্গম স্থানেই ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহারা বিদ্রোহের কেন্দ্র করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল না। রাজ্ঞীর পারিষদ তুর্কী আমীরগণ তাঁহাকে পথশ্রমে কাতর দেখিয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সহসা দানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। অশ্বশালার পর্য্যবেক্ষক হাবশী ইয়াকুতের উপরেই তাহাদের আক্রোশ সবচেয়ে বেশী। সে

বিজাতীয়, রাজ্ঞীর অনুগ্রহভাজন, অনুগত, একেবারেই বিশ্বাস-ঘাতক নহে। অতএব আগেই ইয়াকুৎকে তাহাদের তরবারির মুখে শির দিতে হইল; তাহার পর রাজ্ঞীর দণ্ড। কুসংস্কারান্ধ, স্বার্থপর, ঈর্ষাপরায়ণ তুর্কী-আমীরগণ তাঁহাকে অসহায় অবস্থায় বন্দী করিয়া তবরহিন্দার দুর্গে কারারুদ্ধ করিল। সিংহী পিঞ্জরাবদ্ধ হইল!

৪

কারাজীবন ; বিবাহ ; পরিণাম

রজিয়তের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় নারীর পক্ষে কারাবাস যে দুর্ব্বিষহ কঠোর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কারাবাসকে কঠোরতর করিয়া তুলিল মনের ক্ষোভ—যাহারা তাঁহার একান্ত নির্ভরের পাত্র, শাসনতন্ত্রের নায়ক, তাঁহারই নিমকে যাহারা হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ, তাহারাই তাঁহাকে এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসঘাতকতায় দুঃখের অতল তলে নিক্ষেপ করিল। রাজ্ঞী মুক্তির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইলেন। কঠোর হস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া তিনি যে দুষ্টগণের শত্রুরূপে পরিগণিত, এবং কুসংস্কারের সনাতন নাগপাশ ছেদন করিয়া শিষ্টগণেরও একান্ত বিরাগভাজন হইয়াছেন, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। তাই রাজধানী হইতে বহু দূরে—তবরহিন্দার কারাকক্ষে নিবদ্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে কেবল অন্ধকারের করাল বিভীষিকাই দেখিতে লাগিলেন—কোথাও এতটুকু আলোর রেখাও দেখিতে পাইলেন না।

রজিয়ৎকে কারারুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহী মালিক-আমীরগণ মহোল্লাসে রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হইলেন এবং রজিয়তের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সুলতান মুঈজ-উদ্দীন্ বহ্‌রাম্ শাহ্‌কে সিংহাসনে

বসাইয়া রাজ্য ও রাজভাণ্ডার লইয়া স্বার্থের ছিনিমিনি খেলা খেলিতে লাগিলেন।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য এই জগতের খেয়াল, সে যে কেমন করিয়া নিশ্চিতকে অনিশ্চিত ও অনিশ্চিতকে নিশ্চিত করিয়া তুলে, বুঝিবার উপায় নাই। হঠাৎ ঘটনা-স্রোতের গতি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে ফিরিয়া গেল। রজিয়ৎ তবরহিন্দার কারাকক্ষে বসিয়া দুঃখময় দিনগুলির দীর্ঘতার কথা, এবং ভাগ্যে আরও বা কি দুঃখদুর্গতি ঘটে, ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছিলেন; সহসা সশব্দে তাঁহার কারাকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। তিনি সন্ত্রস্ত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, অল্‌তুনিয়া মুক্ত দ্বার দিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সে বিদ্রোহিগণের অগ্রণী। তাহার অভিপ্রায় কি? হত্যা করা, না আর কিছু? উদ্বেগাকুল, ভগ্নহৃদয় রজিয়তের আশঙ্কা দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে পরিণত হইল। অল্‌তুনিয়া লজ্জিত ও অনুতপ্ত! সে আজ শত্রুবেশে আসে নাই, মিত্রভাবেই তাঁহার নিকট উপস্থিত!

এত দিনে অল্‌তুনিয়ার চৈতন্যোদয় হইয়াছে। লোকটা যে নিতান্ত মন্দ তাহা নহে; ঘটনাচক্রে, সুহৃদের কুপরামর্শে, 'আশার ছলনায়' ভুলিয়াই রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার আশা দুরাশায় পরিণত হইয়াছে। তিনি ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বিদ্রোহের ফলে বিদ্রোহী নামের কলঙ্ক অর্জ্জন-বই তাঁহার আর কোনও লাভই হয় নাই; অপর পক্ষে তাঁহাকেই ক্রীড়াপুত্তল করিয়া তাঁহার সহযোগীরা নিজ নিজ স্বার্থ

ষোল আনা সিদ্ধ করিয়া লইয়াছে—দিল্লীতে তাহারাই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা, তিনি কেহই নহেন। দেখিয়া শুনিয়া অল্‌তুনিয়ার পক্ষে আত্মসংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর সহযোগীদের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। দেখিলেন, প্রতিশোধের এক অপূর্ব্ব উপায় তাঁহার হাতের কাছেই রহিয়াছে। ইচ্ছা করিলেই তিনি তাঁহার ঘৃণিত সুহৃদ্বর্গকে বিস্মিত, স্তম্ভিত, এমন কি, অতি গুরু দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন।

অল্‌তুনিয়া রাজ্ঞীর নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তার পর সসঙ্কোচে এইরূপ অভিপ্রায় জানাইলেন, তিনি তাঁহাকে মুক্তি দিবেন। শুধু মুক্তিও নয়, যদি তিনি সম্মতি দেন, অল্‌তুনিয়া তাঁহাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার যাহারা শত্রু,—অল্‌তুনিয়ার যাহারা দুষমন্—তাহাদের বিরুদ্ধে একবার তিনি মাথা তুলিয়া দাঁড়ান,—কৃত কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করেন।

সম্পূর্ণ আকস্মিক অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত এই প্রস্তাব। রজিয়ৎ অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি ত জানিতেন, কারাগারের দ্বার আর উন্মোচিত হইবে না—এইখানেই তাঁহাকে পচিয়া মরিতে হইবে, তাঁহার পিতৃদত্ত রাজ্যের উন্নতিকামনা এই কারাগর্ভেই বিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু কারাকক্ষের দ্বার অপ্রত্যাশিত হস্তে উন্মোচিত হইয়াছে, আর সেই হস্ত তাঁহার রাজ্যের কণ্টক দূর করিয়া দিবার জন্য অগ্রসর। রাজ্য ধ্যান, রাজ্য জ্ঞান, রাজ্যের জন্য তিনি যে তাঁহার রমণী-হৃদয়কে পুরুষোচিত কঠোর করিয়া

তুলিবার সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন! তাঁহার সেই প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর রাজ্য তাঁহাকে যেন বাহু বিস্তার করিয়া আকুলকণ্ঠে আহ্বান করিতেছে—"এস, এস, ফিরে এস।" তিনি ইচ্ছা করিলেই সেই রাজ্যের দুঃখদুর্গতি দূর করিয়া দিয়া সিংহাসনে স্থির হইয়া বসিতে পারেন। রজিয়ৎ অল্‌তুনিয়ার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তার পর যথাসময়ে অল্‌তুনিয়াকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিয়া নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। অল্‌তুনিয়াও কৃতার্থ হইয়া গেলেন।

বিবাহের পর উপযুক্ত বাহিনী সাজাইবার আয়োজন চলিতে লাগিল। খোকর্ ও জাঠগণের মধ্য হইতে বহু সেনা সংগৃহীত হইল। নিকটবর্ত্তী জাগীরের কয়েক জন আমীরও আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগদান করিলেন। অভিযানকালে বিপক্ষীয় সেনাদলের মালিক ইজ্জ্-উদ্দীন্ মুহম্মদ সালারী, এবং মালিক করাকুশ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। মহাসমারোহে রজিয়ৎ স্বামীর সঙ্গে পাশাপাশি সমরাঙ্গণে অবতরণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

যে বিপুল আনন্দময় ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন ও সংরক্ষণই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রতরূপে পরিগণিত ছিল, আজ তাহা দৈবদুর্ব্বিপাকে হস্তচ্যুত হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণের স্বেচ্ছাচারের লীলাস্থলী হইয়াছে, তাহার উদ্ধারসাধনের জন্য রজিয়তের যত্ন ও চেষ্টার কোন ত্রুটিই হইল না।

কিন্তু দিল্লীর বহির্ভাগে নব সম্রাট্ বহ্‌রাম্ শাহ্‌র সহিত তাঁহাদের যে সঙ্ঘর্ষ হইল, তাহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া

পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। ভাগ্য যাহাদের প্রতি বিমুখ, সহায়সম্পদ্ কদাচ তাহাদের বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না। যে-সকল সৈন্য তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছিল, কইথাল* নামক স্থানে উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

দম্পতি নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে দাঁড়াইলেন। কাল ইঁহাদের একজন ছিলেন বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী, আর একজন তবরহিন্দার সুবিখ্যাত সামন্ত, ঐশ্বর্য্যে প্রতিপত্তিতে ইঁহাদের তুলনাস্থল ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আর আজ তাঁহারা সর্ব্বহারা পথের ফকীর! অবস্থার কি শোচনীয় অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! কিন্তু ইহাই নিয়তির সর্ব্বশেষ নিষ্ঠুর ছলনা নহে। এই অসীম শূন্য গগনের তলে, বিশাল ধরণীর ক্ষুদ্রতম স্থানে, পর্ণকুটীরে, বৃক্ষতলে, যেখানে হাজার হাজার দীনহীন নরনারীর জুড়াইবার স্থান, সেখানেও এই দুঃস্থ দম্পতির জীবনের দিনগুলি কোনরূপে অতিবাহিত করিবার জন্য এতটুকু ঠাঁই হইতে পারিল না। কইথালের হিন্দু-জমিদারগণের হস্তে বন্দী হইয়া† তাঁহারা অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন (অক্টোবর

---

* কর্ণাল হইতে ৩৮ মাইল দূর, এবং দিল্লীর প্রায় ১০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

† *T-i-Nasiri*. অপর এক বিবরণে প্রকাশ, তাঁহারা বন্দী-অবস্থায় বহ রাম শাহর নিকট আনীত হইলে, তাঁহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

১২৪০)। মুসলমান-রাজত্ব রাজ্ঞীর সুশাসনে যে শক্তিসঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করিয়াছিল, রাজা ও রাণীর সম্মিলিত শাসনে তাহা যে সত্য হইয়া, বিরাট্ হইয়া উঠিতে পারিত, তাহা আপাততঃ স্বপ্নে পরিণত হইল। নবদম্পতির মনের কামনাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই কইথালের তৃণতলে চিরসমাধি লাভ করিল।

রজিয়তের রাজত্বকাল দীর্ঘ নহে—মোটে তিন বৎসর, তিন মাস, ছয় দিনের। কিন্তু ইহারই মধ্যে যে-সব বাধাবিঘ্ন ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহাতে ঐতিহাসিক ঘটনার স্থান অল্প ছিল না। কিন্তু সন্ধান হইয়াছে অল্পই; সন্ধান হয় নাই, এরূপ ঘটনারও আভাস যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে, শুধু প্রকাশের সূত্রই খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। এই সব প্রকাশ পাইলে রজিয়তের ইতিহাস যে ভারত-ইতিহাসের একটা দিক্ অপূর্ব্ব রাগে রঞ্জিত করিয়া তুলিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু উপস্থিত যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহাও অবহেলার নহে; রজিয়ৎ-রাজত্বের বৈশিষ্ট্য, এবং রজিয়ৎ-চরিত্রের বৈচিত্র্য ও বিশালতার পরিচয়, ইহারই মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। ধ্বংসাবশেষ স্তম্ভের গুরুত্ব এবং স্তূপের প্রসারতা দেখিয়া যেমন ঐশ্বর্য্যময় রাজপুরীর অতীত-গৌরবের উপলব্ধি হয়, কালের করাল হস্তচ্যুত দুই চারিটি ছিন্নভিন্ন ঘটনা-সমবায়েও তেমনই রজিয়ৎ-রাজত্বের অপূর্ব্ব কাহিনী জীবন্ত হইয়া উঠে।

এখন হইতে প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে রাজ্ঞী রজিয়ৎ দিল্লীর রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। দিল্লীর রাজসিংহাসনে মুসলমান-মহিলার উপবেশন ইহাই প্রথম এবং ইহাই শেষ।

বহুকাল পরে মোগল-আমলে কোন কোন মনস্বিনী মহিলা সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু পর্দ্দার ঘোর তাঁহারা কেহই কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই,—জনান্তিকে সম্রাটের বা সিংহাসনের আড়ালে থাকিয়াই যথাসাধ্য কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। কিন্তু এই তেজস্বিনী নারী পর্দ্দার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। না, শুধু পর্দ্দার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা বলিলেও তাঁহার সম্বন্ধে সুবিচার করা হইবে না,—জাতি ধর্ম্ম ও সমাজের মজ্জাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

রমণীকে যোগ্যতার উপযুক্ত সম্মান দিতে আমরা পুরুষেরা যে নিতান্তই নারাজ, এ কথাটা শ্রুতিকটু হইলেও যে নিরতিশয় সত্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একালে এই বিংশ শতাব্দীতেও যখন সমস্ত জগৎ সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিতেছি, তখনও রমণীর অধিকারের স্থানটিকে আমরা যথাসাধ্য আড়াল করিয়া রাখিবার চেষ্টা হইতে বিরত হই নাই। আর রজিয়তের কথা ত আজিকার কথা নহে—প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। বিশেষ তিনি অতিরক্ষণশীল মুসলমান-সমাজের কন্যা। রমণীর সিংহাসনে উপবেশনের ব্যাপার তখন অলীক অসম্ভব রূপকথা মাত্র। সুতরাং প্রতিকূলতার আর অন্ত ছিল না।

শুধু একমাত্র আনুকূল্য ও প্রেরণার স্থান তাঁহার পিতা—ইয়লতিমিশ্। কন্যাকে সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব তিনিই

করিয়াছিলেন। অবশ্য পুত্রেরা অনুপযুক্ত বলিয়াই রাজ্যরক্ষার ভার তিনি উপযুক্ত কন্যার হস্তে অর্পণ করিবার অভিপ্রায় করেন। কিন্তু এইরূপ অভিপ্রায়ের মধ্যেই কি তাঁহার ঔদার্য্যের, তেজের ও স্বাধীন-চিত্ততার পরিচয় নাই? ধর্ম্মমত বিরোধী,—সমাজ, আত্মীয়স্বজন জনমত প্রতিবাদী, সংস্কার প্রতিকূল, বৃদ্ধ ইয়লতিমিশ মন্ত্রিগণকে বলিতেছেন,—'কন্যা সিংহাসনে বসে, ইহাই আমার অভিপ্রায়। আপনারা আমার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করুন।' স্বোপার্জ্জিত রাজ্যে ইয়লতিমিশের মমত্ববোধ যে কতখানি, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু চিরাচরিত প্রথা, বদ্ধমূল সংস্কার, এবং কঠোর বিধি-নিষেধের কাছে প্রতিনিয়তই কি আমরা আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় বস্তুকে অস্বীকার করিতেছি না? কয় জনে আমরা সনাতন জড়তার পাশ ছিন্ন করিয়া ন্যায়পথের যাত্রী হই? লাখে একজনও কি না সন্দেহ। সুলতান্ ইয়লতিমিশ্ সেই দুর্ল্লভ—সেই অসাধারণ চরিত্রের লোক। তাঁহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য কন্যা রজিয়তে পরিপূর্ণমাত্রায় বর্ত্তিয়াছিল, তিনি জনমতকে আপনার বিবেক-বুদ্ধির কাছে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন।

কিন্তু সুলতানের মন্ত্রিসমাজ অত্যন্ত সাধারণ প্রকৃতির লোক। ইয়লতিমিশ্ বা তাঁহার কন্যার চরিত্র তাঁহাদের কাছে অতি উচ্চ, অতি দুর্ব্বোধ। তাঁহারা সকলে শিহরিয়া উঠিয়া একবাক্যে সুলতানের প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন,—'এ যে নিতান্তই অসম্ভব অসঙ্গত কথা, জনাব!' যাঁহারা কন্যার অভিভাবকস্থানীয় হইয়া তাঁহার সিংহাসন-রক্ষার সহায়স্বরূপ হইবেন, তাঁহাদের মুখে এই

প্রতিবাদের ঘোরতর কোলাহল! সুলতান্ হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—'কাজটা কিন্তু বড় ভাল হইল না। ফলাফল পরে বুঝিতে পারিবে।'

সুলতানের মৃত্যুর পর মন্ত্রীরা যে রজিয়ৎকে সিংহাসন দেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহারা রজিয়তের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রুক্‌ন-উদ্দীনকে সিংহাসনে বসাইয়া বুঝিলেন, দূরদর্শী সুলতানের কথাটা বড় সত্য। বিলাসী অকর্ম্মণ্য রুক্‌নের শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া দেশব্যাপী অরাজকতার তাণ্ডব নৃত্য সুরু হইল, অত্যাচার-অবিচারের আর অবধি রহিল না। প্রজার অসন্তোষ ও অশান্তিতে ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন,—রুক্‌নের গর্ভধারিণী, উগ্র-প্রকৃতি শাহ্ তুর্কান্। পাছে সন্তানের সিংহাসনের কোন বিঘ্নবিপত্তি ঘটে, সেই ভয়ে অতি সতর্ক শাহ্ তুর্কান্ রাজপুরীকে কসাইখানার মত রক্তাক্ত করিয়া তুলিলেন। সুলতানের অন্যান্য বেগমেরা তাঁহার হস্তে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন, কুমার [illegible]বের চক্ষুরত্ন উৎপাটিত হইল। কিন্তু অভীষ্ট পথের প্রবলতম অন্তরায় রজিয়ৎ তাঁহার চক্ষের উপর জীবিত! তুর্কান্ যে তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন, ইহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। তাঁহাকে ধ্বংস করিবার জন্য তিনি ভীষণ ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। অকস্মাৎ বিধাতার রুদ্ররোষ তাঁহার মাথার উপর গর্জ্জিয়া উঠিল। উত্তেজিত নাগরিকগণ ভীম-পরাক্রমে রাজধানী আক্রমণ করিয়া শাহ্ তুর্কান্‌কে বন্দী করিল। রাজনন্দিনী রজিয়ৎ সিংহাসন জুড়িয়া বসিলেন।

ইতিহাসে রজিয়তের সিংহাসন প্রাপ্তির এই ঘটনাটুকুই আছে, তাহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। কিন্তু বিষাক্ত সর্পের বিবরে বাস করিয়াও যে তিনি কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিলেন, কেমন করিয়া নাগরিকগণ তাঁহার প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইয়াছিল, সে-সকল কাহিনী জানিবার জন্য পাঠকের চিত্ত স্বভাবতই উন্মুখ হইয়া উঠে; কিন্তু ইতিহাস তৎসম্বন্ধে নীরব বলিলেই হয়। ইতিহাসের এই নীরবতা ভঙ্গ করিতে পারিলে হয়ত রজিয়ৎ-চরিত্রের আরও একটা উজ্জ্বল অংশের সহিত আমরা পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হইতাম। কিন্তু সেই নীরবতা-ভঙ্গের আয়োজন এখনও হইয়া উঠে নাই।

যাহা হউক, সিংহাসন পাইবার পর তিনি শুধু সিংহাসনের শোভা হইয়া রহিলেন না, রাজদণ্ড-ধারণের শক্তি ও সামর্থ্য তাঁহার কত দূর, অচিরে প্রজাপুঞ্জ তাহার পরিচয় পাইল। রুক্‌ন-উদ্দীন্ সসৈন্যে তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। রমণী-শাসনের নিকট মাথা নত করিবার ইচ্ছা অনেক সম্ভ্রান্তেরই ছিল না। উজীর নিজাম্-উল্-মুল্ক, তাহাদিগকে সম্মিলিত করিয়া রাণীর বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। কিন্তু তাঁহার তেজ বীর্য্য ও ধৈর্য্যের নিকট সে আয়োজন ব্যর্থ হইতে অধিক দিন লাগিল না। তার পর নানা স্থানে যে বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির কারণ ঘটিয়াছিল, তাহাও তিনি দূর করিয়া রাজ্যকে শান্ত ও সংযত করিলেন। বঙ্গ হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের

মালিক-আমীরগণ সসম্মানে রাজ্ঞীর নিকট উপঢৌকন আদি প্রেরণ করিয়া মস্তক অবনত করিলেন। রাজ্ঞীর মোহরাঙ্কিত মুদ্রা তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির নিদর্শনস্বরূপ রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হইল।*

কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল রাজ্যকে সুশৃঙ্খল করিয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা ত সহজ কথা নহে, ইহার জন্য কুমারী রজিয়ৎকে প্রাণপণ করিতে হইয়াছিল। তিনি জানিতেন, অবলার দুর্ব্বলতার অখ্যাতি চির-দিনের। এই অখ্যাতির সুযোগে দুর্ব্বৃত্তেরা যে-কোন মুহূর্ত্তে রাজ্যে অমঙ্গলের সূচনা করিতে পারে, তাই তিনি অন্তরে বাহিরে পুরুষ সাজিয়া দৃঢ়হস্তে রাজ্যের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন। রজিয়ৎ প্রকাশ্যে রাজসিংহাসনে বসিয়া দরবার করিতেন, রমণীর বেশে নহে—পুরুষের বেশে, সুলতানের সাজ সাজিয়া। নগরেও বাহির হইতেন, ঐ পুরুষের বেশে—মাথায় টুপী, গায়ে কোর্ত্তা,

---

* রজিয়তের নামে সর্ব্বপ্রথমে যে মুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহাতে খোদিত ছিল :—

(মুদ্রার এক পৃষ্ঠে) উম্‌দৎ-উন নিসুয়ান্ মাল্‌কা-এ-জমান্ সুলতান রজিয়ৎ বিন্‌ৎ শমস্-উদ্দীন্ ইয়লতিমিশ্।

(অপর পৃষ্ঠে) জর্ব বল্‌দা-এ-দেহ্‌লী সনেঃ ৬৩৪ জলুস-ই-আহদ্।

অর্থাৎ—নারীশ্রেষ্ঠ, যুগনিয়ন্ত্রী, সুল্‌তান রজিয়ৎ—শমস্-উদ্দীন ইয়ল্‌তিমিশের কন্যা। দিল্লীনগরে অঙ্কিত, সিংহাসনারোহণের প্রথম বর্ষ, ৬৩৪ হিজরী।

রজিয়তের রাজমুদ্রায় "সুলতান রজিয়ৎ-উৎ-দুনিয়া-ওয়া-উদ্দীন" এইরূপ নামও মুদ্রিত দেখা যায়।

কটিতে তরবারি, ঘোড়ায় চড়িয়া। মনে হইবে গল্প। কিন্তু সত্য ঘটনা যে অনেক সময়ে গালগল্পের চেয়েও অদ্ভুত হয়, এ কথা মিথ্যা নহে।

ইতিহাস সব কথা খতাইয়া লিখে না, লিখিবার দরকারও নাই। বড় বড় কথা—রাজ্য ও রাজনীতির সঙ্গে যার সংস্রব মুখ্য, সে শুধু তার কথাই পাড়িয়া থাকে, বাদবাকী অনেক কথা অনেক সময় পাঠককে জোড়াতাড়া দিয়া ঠিক করিয়া লইতে হয়, নতুবা ইতিহাসের পাঠ সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না। পুরুষের বেশে রমণীর এই যে প্রকাশ্য দরবার, এই যে নগর-পরিভ্রমণ, ইহা লইয়া কি ঘরে ঘরে অপ্রীতিকর আলোচনার সৃষ্টি হয় নাই? শত্রুপক্ষ প্রকাশ্যে না হউক, অপ্রকাশ্যে অসঙ্গত বিদ্রূপহাস্যের তরঙ্গ তুলে নাই? কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্তরালবর্ত্তিনীরা সকৌতুকে সন্তর্পণে পর্দ্দার একটি প্রান্ত তুলিয়া ধরিয়া রাণীর এই অপূর্ব্ব নগর-পরিভ্রমণ দেখিতে দেখিতে লজ্জায় ভয়ে সারা হয় নাই? ইতিহাসে ইহার কিছুই নাই; কিন্তু এমনই সব ঘটনা যে ঘটিয়াছিল, তাহার কি অণুমাত্রও সন্দেহ আছে? ঘটনা ঘটিত, এবং সজাগ সতর্ক তীক্ষ্ণবুদ্ধি রজিয়তের কাছে কিছুই অজ্ঞাত থাকিত না, কিন্তু তিনি গ্রাহ্য করিতেন না; কর্ত্তব্যের কাছে বিচার-বুদ্ধিহীন জনসমাজের মতামতকে তৃণবৎ অসার বলিয়া মনে করিতেন। ইহা অবশ্য তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার একটা বিশিষ্ট পরিচয়—একটা মস্ত বড় গুণ। কিন্তু গুণও যে অনেক সময় দোষের আকার ধারণ করে, তাহা মিথ্যা নহে। এই পুরুষোচিত দৃঢ়তাই রজিয়তের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল। কেমন করিয়া, তাহা বলিতেছি।

হাব্‌শী জমাল্‌-উদ্দীন্‌ রাণীকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিত। ব্যাপারটা নূতন নহে; সুলতানেরা, এমন কি, মোগল বাদশাহ্‌রাও অশ্বপালের সাহায্যে ঘোড়ায় উঠিতেন। আর একালেও কি বড়মানুষেরা সহিসের কাঁধে ভর না দিয়া ঘোড়ায় উঠেন? রমণী হইয়াও তিনি এই বাদশাহী-দস্তুর পরিহার করেন নাই; তাহার পর দেখা যাইতেছে, এই বিজাতীয় হাব্‌শীটি রাণীর একটু অধিক অনুগ্রহভাজন হইল! আর কি রক্ষা আছে? তুর্কী আমীর-মালিকগণের মনের ছাই-চাপা আগুন একেবারে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মহাপুরুষের কথা অমান্য করিয়া এই নারী সিংহাসনে বসিয়াছে, পর্দ্দার আড়াল ঘুচাইয়াছে, ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপথে বাহির হইয়াছে, তাহার উপর তুর্কীগণের চক্ষুশূল যে অসভ্য হাব্‌শী, সেই জাতের একটা নগণ্য লোক—জমাল্‌-উদ্দীনের উপর অনুগ্রহ! সে অনুগ্রহের মাত্রাটাও আবার একটু বেশী। ক্রোধোন্মত্ত তুর্কী-প্রধানেরা রাণীর সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য চারি দিকে অসন্তোষের অনল ছড়াইতে লাগিলেন। রাণীর কার্য্যে অনেকেরই মনের সনাতন জড়তায় আঘাত লাগিয়াছিল, সুতরাং দল ক্রমশই পুষ্ট হইয়া উঠিল।

রাজ্ঞী অসন্তোষের কারণ জানিয়াও প্রতিকার করিলেন না,—জমাল্‌-উদ্দীনের প্রতি অনুগ্রহের ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। জমাল্‌ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিমকের মান রক্ষা করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই।

তবরহিন্দার সামন্তরাজ অল্‌তুনিয়ার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

তাঁহার সৈন্যসামন্ত ও অর্থসম্পৎ প্রচুর। লোকটাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারিলে, কাজ সহজেই হাসিল হইতে পারে। অল্‌তুনিয়া যদিও বর্ত্তমান পদমানের জন্য, ঐশ্বর্য্য-প্রতিপত্তির জন্য রাণীর কাছে বিশেষভাবে ঋণী, তাঁহারই প্রসাদে তবরহিন্দার সামন্ত,—তথাপি মালিকগণের প্ররোচনায় অল্‌তুনিয়ার পক্ষে নিমকের মর্য্যাদা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি প্রকাশ্যভাবে রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। বিরুদ্ধ-পক্ষের উদ্দেশ্যসিদ্ধির আর কালবিলম্ব হইল না। রাণী সসৈন্যে অল্‌তুনিয়াকে দমন করিতে গিয়া আপনার অর্থপুষ্ট তুর্কী আমীর-মালিকগণের হস্তে অসহায় অতর্কিত অবস্থায় ধৃত হইয়া তবরহিন্দার দুর্গে বন্দী হইলেন। তাহাদেরই তরবারির মুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া 'নিমকের নোকর' হাব্‌শী জমাল্‌-উদ্দীন্‌ রাণীর অনুগ্রহের ঋণ সুদে-মূলে পরিশোধ করিল।

কিন্তু অল্‌তুনিয়ার শুধু নিমকহারামি করাই সার হইল, কিছুই লাভ হইল না। যাহাদের প্ররোচনায় তিনি সুনাম হারাইয়া, ন্যায়ধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়া, বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, সেই বিশ্বাসঘাতক আমীর-মালিকেরা দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়া স্বার্থের ষোল আনা ভাগ নিজেরাই গ্রাস করিয়া ফেলিল, তাঁহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিল না। রোষে ও ক্ষোভে অল্‌তুনিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। রাজ্ঞী রজিয়ৎ ত কখনও তাঁহার ইষ্ট-বই অনিষ্ট করেন নাই, তাহার উপর রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থা করিয়া প্রজাপুঞ্জের হৃদয় অধিকার করিয়াছেন।—তাঁহারই বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ! এই ঘৃণিত কার্য্যের ফল তাঁহার যাহা হওয়া উচিত, হইয়াছে; কিন্তু যাহাদের ছলনা তাঁহাকে এই কার্য্যে লিপ্ত করিয়াছিল, তাহারা স্বচ্ছন্দমনে সুখের সাগরে সাঁতার কাটিবে, আর তিনি তাহাই বসিয়া বসিয়া দেখিবেন, সে ত কিছুতেই হইতে পারে না।—অল্‌তুনিয়া অধীর অশান্তমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রজিয়ৎ ছিলেন তবরহিন্দার কারাগারে। তাঁহারই অর্থপুষ্ট আমীর-মালিকেরা যে তাঁহাকে বিঘোরে ফেলিয়া অসহায় অবস্থায় বন্দী করিবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সমস্তটা পৃথিবীর স্মৃতিই যেন নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিষাক্ত ছুরি লইয়া তাঁহার অন্তঃকরণটাকে দীর্ণ বিদীর্ণ করিতেছিল। আর কারানিরুদ্ধ হতভাগিনী জেব্‌-উন্নিসার মত তিনিও হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছিলেন,—

জেনে রাখ্‌, বন্দী তুই, শেষ দিন না আসিলে আর,
নাই নাই—আশা নাই খুলিবে যে লৌহ-কারাগার।

কিন্তু এক দিন অকস্মাৎ সত্য সত্যই তাঁহার কারাকক্ষের দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, তবরহিন্দার সামন্তরাজ—অল্‌তুনিয়া তাঁহার সম্মুখে!

তবরহিন্দার সামন্তরাজ অতঃপর যে শুধু রজিয়তের নিকট ক্ষমা চাহিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিলেন, তাহা নহে—প্রস্তাব করিলেন, রজিয়ৎ যদি তাঁহাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করিতে সম্মত হন,

তাহা হইলে তিনি তাঁহার রাজ্যোদ্ধারের ও আমীর-মালিকগণকে বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। রজিয়ৎ অসম্মত হইলেন না। যে-রাজ্যের অনুরোধে তিনি নারীত্বকে বিস্মৃত হইয়া পৌরুষের সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই রাজ্যের অনুরোধেই আবার তিনি নারী হইয়া অলতুনিয়াকে বরমাল্য দিতে প্রস্তুত হইলেন।

ঠিক যেন একখানি সুরচিত নাটকের একটি সুন্দর দৃশ্য আমাদের মানস-চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া গেল। দুইটি চরিত্র তাহাতে যে ভাবের অভিনয় করিলেন, তাহা আগাগোড়া ঔৎসুক্যের উদ্দীপক। এমন কি, ইহার পর আরও কি হয়—তাঁহাদের মিলন এবং মিলনের ফলাফল—দেখার জন্যও মনে একটা উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়া রহিল। শুধু এই একটি মাত্র দৃশ্য নহে, রজিয়তের সমগ্র জীবনই একখানি ঔৎসুক্যময় বিচিত্র নাটকের রঙ্গভূমি। ঘটনা-সংঘাতে ঘটনার সৃষ্টি, অন্তরের আন্দোলন, বিঘ্নবিপত্তির সহিত মানব-জীবনের কঠোর সংগ্রাম, ভাগ্যচক্রের অতর্কিত নিষ্ঠুর পীড়ন, প্রভৃতি নাটকীয় উপকরণ ইহাতে পুঞ্জীভূত। আশ্চর্য্যের বিষয়, বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে রজিয়তের নামে যে দৃশ্যকাব্যের অভিনয় হয়, তাহাতে এই সকল ঐতিহাসিক উপকরণ আণুবীক্ষণিক অনুসন্ধানেও ধরিবার উপায় নাই। তাই রজিয়তের মত বীর-চরিত্রকে রঙ্গমঞ্চে প্রেমের হুঙ্কারজনক অভিনয় করিতে দেখিয়া আমাদিগকে শিহরিয়া উঠিতে হয়। যে-নারী বিপদের পর্ব্বত-প্রমাণ বাধাকে পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া সিংহাসন জুড়িয়া বসে,

বিদ্রোহের দাবানল নির্ব্বাপিত করিয়া রাজ্যে শান্তির শীতল ছায়া বিস্তার করে, অথবা লোকলজ্জাকে জঞ্জালের মত দূর করিয়া দেয়—সেই নারী বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে অন্যায় অবৈধ প্রেমের ভিখারিণী! আরও লজ্জার কথা এই, দর্শকেরা সাড়ম্বরে চট্‌পট্‌ করতালিধ্বনি-সহকারে ইতিহাসের এই বর্ব্বরোচিত অবমাননা স্বচ্ছন্দচিত্তে উপভোগ করিয়া থাকেন!

রজিয়তের সমস্ত জীবনের মধ্যে শুধু একটি স্থানে একটু প্রতিকূল সমালোচনার অবকাশ আছে, তাহা জমাল্-উদ্দীনের প্রতি অনুগ্রহ। কার্য্যগতিকে রাণীর সন্নিহিত হইবার যে-সুযোগ জমাল্-উদ্দীনের ছিল, সে-সুযোগ কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকেরই ছিল না। এই সূত্রেই সে মনিবের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু রাণীর অসঙ্কোচ পুরুষোচিত চালচলন, সর্ব্বোপরি স্বহস্তে শাসনকার্য্য-পরিচালন, আমীর-মালিকগণের বুদ্ধি, সংস্কার এবং স্বার্থকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। এমন কি, পুরুষের রাজত্বকালেও নানা দিকে তাহাদের যে স্বার্থসিদ্ধির পথ ছিল, সজাগ সতর্ক রাণীর রাজত্বে তাহা নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রে রুষ্ট আমীর-মালিকগণের যে-কোন অজুহাতে রাণীর সর্ব্বনাশ-সাধনের চেষ্টা করা স্বাভাবিক। জমাল্-উদ্দীনের প্রতি রাণীর অনুগ্রহের কথাটাও যে তাহাদের একটা অজুহাতমাত্র নহে, তাহা কি কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে? তাহারা তিলকে তাল করিয়া রাজ্য জুড়িয়া অশান্তি উদ্দীপনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। চেষ্টার ফল ফলিয়াছিল সত্য, কিন্তু

আশানুরূপ ফলিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। নিকটের লোকেরা বিদ্রোহী হয় নাই; বিদ্রোহী হইয়াছিল তবরহিন্দার মালিক অল্‌তুনিয়া। অল্‌তুনিয়া জমাল্‌-উদ্দীনের সঙ্গে রাণীর সংস্রবের কল্পনায় উত্তেজিত হন নাই, হইলে কদাচ ইহার পর তাঁহাকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করিয়া কৃতার্থ হইতেন না। তাঁহার বিদ্রোহের কারণ স্বার্থ। সেই স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত হওয়াতেই যে অল্‌তুনিয়া আমীর-মালিকগণের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য রজিয়ৎকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য। ক্রোধে মানুষ অনেক সময় অনেক অবিবেচনার কাজ করে, অতএব তিনিও করিয়াছিলেন—এরূপ সন্দেহ পাঠকের মনে উদয় হইতে পারে। কিন্তু বিবাহ না করিয়াও কি রজিয়তের সঙ্গে যোগ দিয়া অল্‌তুনিয়া আমীর-মালিকগণকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন না? তার পর কলঙ্কিনীকে বিবাহ কি কোন ভদ্রসন্তান—বিশেষ তাঁহার মত সম্ভ্রান্ত ক্ষমতাপন্ন লোক—জানিয়া-শুনিয়া করিতে পারেন?

মোট কথা, রজিয়তের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিবার মত কোন প্রমাণ ইতিহাসে নাই।* 'অতিরিক্ত অনুগ্রহে'র কথায় একটা অতি ক্ষীণ সন্দেহের কারণ জন্মিতে পারে মাত্র, কিন্তু তাহার প্রতিকূলে বলিবার কথা অনেক। সুতরাং ইহারই সূত্রে

* মেজর রাভার্টি লিখিয়াছেন:—"I think the character of this Princess has been assailed without just cause."—*T-i-Nasiri*, i. 642 *n*.

তাঁহাকে অবৈধ প্রেমের নায়িকারূপে দাঁড় করান যে কত বড় ধৃষ্টতা, পাঠকেরা তাহা অনুমান করিবেন। একজন ঐতিহাসিক রজিয়তের সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—"Those who scrutinize her actions will find no fault but that she was a woman." (Briggs' Ferishta, i. 217-8). অর্থাৎ রজিয়তের একমাত্র অপরাধ যে, তিনি স্ত্রীলোক! যাঁহারা তন্ন তন্ন করিয়াও তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিবেন, তাঁহারাও তাঁহার দোষের সন্ধান পাইবেন না। কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য।

শুধু যে রণাঙ্গনে সৈন্য-পরিচালনায় রজিয়তের কৃতিত্ব, গুণের পরিচয়, তাহা নহে,—তিনি বিদুষী, তিনি সহৃদয়া, তিনি গুণগ্রাহিণী। কোরাণে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; তিনি এই ধর্ম্মগ্রন্থ বিশুদ্ধ উচ্চারণের সহিত পাঠ করিতে পারিতেন। আওরংজীব-দুহিতা জেব-উন্নিসার ন্যায় তিনিও সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণের উৎসাহদাত্রী ছিলেন।*

রজিয়তের পরবর্ত্তী জীবন ব্যর্থতার কাহিনীতে করুণ। তাঁহা[illegible] সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। যে রাজ্যো[illegible]র

* "Sultan Raziyyat—may she rest in peace!—was a great sovereign, and sagacious, just, beneficent, the patron of the learned, a dispenser of justice, the cherisher of her subjects, and of warlike talent, and was endowed with all the admirable attributes and qualifications necessary for kings."—Minhaj: *Tabakat-i-Nasiri*, p. 637.

আশায় তিনি অল্‌তুনিয়ার গলায় বরমাল্য অর্পণ করিলেন, সে আশা তাঁহার পূর্ণ হইল না। স্বামি-স্ত্রী প্রচুর শক্তি সংগ্রহ করিয়াও আমীর-মালিকগণের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন বটে, জয়লাভ করিতে পারিলেন না। পরাজিত হইয়া তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে হইল; তার পর হিন্দু-জমিদারগণের হস্তে ধরা পড়িয়া তাঁহাদিগকে অতি নিঃসহায় অবস্থায় প্রাণ দিতে হয়। কিন্তু কেমন করিয়া তাঁহারা ধরা পড়িলেন, হিন্দু-জমিদারগণ তাঁহাদিগকে কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিলেন, অন্তিম কালে তাঁহাদের কি বলিবার ছিল, কোন্ কথা উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন, আজ তাহার কিছুই জানিবার উপায় নাই, ইতিহাস সে সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া বিষাদের একটা সুগভীর রহস্যজাল রচনা করিতেছে!

নূরজহান্

১

বাল্যজীবন ; যৌবন—নবানুরাগ

ঘিয়াস্-উদ্দীন্ মুহম্মদ পারস্য দেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোক। রাজা শাহ্ তহ্মাস্পের এলাকা—খোরাসানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পিতা খাজা মুহম্মদ শরীফের মৃত্যুর পর অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাঁহার বড় অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়,—রাজার রাজস্ব বাকী পড়ে; বিষয়-সম্পত্তি বেহাত হইয়া যায়। এক সময় যিনি দাসদাসী লইয়া পরম সুখে কাল কাটাইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে নিজের দেশে দীনহীনের মত বাস করা বড় কষ্টকর—বড় অপমানের বিষয় বলিয়া বোধ হইল।

তখনকার দিনে পারস্য ও মধ্য-এশিয়াকে ইরাণ তুরাণ বলিত। সেই ইরাণ তুরাণ হইতে বহু লোক ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভারতে আসিত। ঘিয়াস্ তাহাদের মুখে ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য—ধনধান্যের কথা শুনিয়াছিলেন। আর সেখানে গিয়া যে অনেকে অবস্থার উন্নতি করিয়াছে, তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি ভাগ্যপরীক্ষার জন্য স্ত্রী, দুই পুত্র ও কন্যা সঙ্গে লইয়া ভারতের পথ ধরিলেন—এক দল ভারতযাত্রী পথিকের সঙ্গে।

কিন্তু পারস্য হইতে ভারতে আসিবার পথ তখন নিরাপদ্

ছিল না। হতভাগ্য ঘিয়াসের যাহা কিছু পথের সম্বল, পথিমধ্যে দস্যুরা তাহা লুঠিয়া লইল। আবার যে কয়টি অশ্বতর বাহন ছিল, তাহাও মরিয়া দুইটিতে দাঁড়াইল। সকলে পালাক্রমে ইহাদের পিঠে চড়িয়া পথ চলিতেন। ঘিয়াসের বিপদের উপর বিপদ্, স্ত্রী গর্ভবতী—আসন্নপ্রসবা—তাঁহার পায়ে হাঁটিয়া পথ চলিবার উপায় নাই। একটি অশ্বতর তাঁহার জন্যই আবশ্যক। ঘিয়াসকে সকল অসুবিধা সহ্য করিয়া ইহার ব্যবস্থা করিতে হইল

কন্দাহারের নিকট পৌছিলে, সেই ঘোর দুর্দ্দিনে, অসহায় অবস্থায়, মরুপ্রান্তে মিহ্র-উন্নিসার জন্ম হইল (১৫৭৬-৭৭)। ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত ঘিয়াস-পত্নী প্রসবকালে বড় কষ্ট পাইলেন; তখন তাঁহাদের না-আছে শুশ্রূষার লোক, না-আছে আহার্য্যের ব্যবস্থা। এই দুঃসময়ে উত্তপ্ত মরুশয্যায় যে শিশুর জন্ম হইল, কে জানিত, বিধাতা তাহার ললাটে ভারতের মহামহিমান্বিত রাজরাজেশ্বরীর অতুলনীয় সুখ-সম্পদের অঙ্কপাত করিয়াছেন।

নবজাত শিশুকে লইয়া স্বামি-স্ত্রীর দুর্ভাবনার অন্ত নাই। অনাহারক্লিষ্টা জননীর বক্ষে দুগ্ধ আসিবে কোথা হইতে? প্রাণাধিক শিশুকে তাঁহারা কিরূপে বাঁচাইবেন? ঘিয়াস্ ও তাঁহার পত্নী পাষাণে বুক বাঁধিলেন। পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, কন্যাটিকে তাঁহারা কাপড়ে জড়াইয়া রাত্রে পথিকদলের মধ্যে রাখিয়া দিবেন—কোন-না-কোন যাত্রী অবশ্যই তাহাকে বাঁচাইবে। শিশু মাতৃবক্ষে অনাহারে শুকাইয়া মরিবে—এ দৃশ্য তাঁহারা কোন্ প্রাণে দেখিবেন?

সুখের বিষয়, যাত্রীদের দলপতি মালিক মাসুদ দয়ার্দ্র হইয়া এই শিশুকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করেন ও তাহার পিতামাতার সহিত পরিচিত হন। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাসুদ বুঝিতে পারিলেন, ঘিয়াস্ ও তাঁহার পুত্র সামান্য লোক নহেন ;—উপযুক্ত সুযোগ পাইলে তাঁহারা অচিরকালমধ্যে ধনে-মানে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন। তিনি তাঁহাদিগকে পরম যত্নে আশ্রয়দান করিলেন ;—তাঁহাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিলেন।

মালিক মাসুদ প্রতি বৎসরই পারস্য হইতে নানাবিধ পণ্য লইয়া ভারতে আসিতেন। এবার তিনি এদেশে আসিয়া শুনিলেন, সম্রাট্ আকবর ফতেপুর সীক্রীতে। মাসুদ তথায় উপনীত হইয়া, বাদশাহ্‌কে বাছিয়া বাছিয়া অনেক মূল্যবান্ জিনিস উপঢৌকন দিলেন। আকবর কিন্তু উপহার দেখিয়া খুশী হইতে পারিলেন না, মাসুদকে বলিলেন,—'এবার কোন চিজ্ই আমার তেমন মনে ধরছে না।'

মাসুদ উত্তর করিলেন,—"জাঁহাপনা! সামান্য সওদাগর আমরা, কাপড় বেচে খাই, শাহান্‌শাহ্ বাদ্‌শাহ্‌র মনে ধরে, এমন চিজ্ আমরা কোথায় পাই বলুন? তবে এ বৎসর আপনার জন্যে গুটিকয়েক 'সজীব' জহরৎ এনেছি। এগুলি অমূল্য ; মেহেরবানী ক'রে রাখ্‌লে বুঝতে পারবেন, এমন উপহার ইরাণ তুরাণ থেকে আর কেউ কখনও ভারতে আনেনি।'

বাদশাহ্ খুশী হইয়া তাঁহাকে ঐ সকল অমূল্য উপহার দরবারে

পেশ করিতে হুকুম দিলেন। মাসুদ তখন ঘিয়াস্ ও তাঁহার পুত্র আবুল-হসনকে রাজদরবারে হাজির করিলেন।

বাদশাহ্ আকবর মানুষ চিনিতে পারিতেন; এই জন্যই তাঁহার দরবারে এত রথী মহারথীর সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি ঘিয়াস্ ও তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া বুঝিলেন, মাসুদ মিথ্যা বলে নাই—এ দুইটি অমূল্য রত্নই বটে। আকবর হৃষ্টচিত্তে ঘিয়াস্ ও তাঁহার পুত্র আবুল-হসন্‌কে (পরে আসফ্ খাঁ) রাজসরকারে চাকুরী দিলেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া বাদশাহ্‌র বিশ্বাসী কর্ম্মচারিরূপে পরিগণিত হইবার সৌভাগ্যলাভ করিলেন।

বাদশাহী হারেমে মাসুদ-পত্নীর যাতায়াতের অনুমতি ছিল। তিনি মিহ্‌র-উন্নিসা ও তাঁহার মাতা আসমৎ বেগমকে সঙ্গে লইয়া প্রায়ই রঙ্গমহলে যাইতেন। ক্রমে মিহ্‌র বাল্য হইতে কৈশোরে, এবং কৈশোর হইতে যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের অসাধারণ মোহিনী-শক্তি ছিল। সে সৌন্দর্য্য দেখিলে বুঝি বা মুনিরও মন টলিত। অন্তঃপুরে মধ্যে মধ্যে যুবরাজ সলীমের সহিত মিহ্‌রের দেখাসাক্ষাৎ হইত। সলীম তাঁহাকে অবাক হইয়া দেখিতেন। দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার মনে কোন্ ভাবের উদয় হইত কে জানে? তিনি মিহ্‌রকে বিশেষ আদর-যত্ন করিতেন। সলীম্ সুপুরুষ—নবীন যুবা; মিহ্‌রও অনুপম রূপলাবণ্যময়ী তরুণী। শাহ্‌জাদার সৌন্দর্য্য-পিপাসু চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। উদ্ভিন্নযৌবনা মিহ্‌রও আপনার হৃদয়ের দ্বার রুদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। উভয়ে

উভয়ের অনুরাগী। ব্যাপারটা অবশ্য খুব গোপনেই অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু প্রেমের কথা আর ফুলের গন্ধ কিছুতেই চাপিয়া রাখা যায় না। সলীম্ যে মিহ্রের রূপে মুগ্ধ—হয়ত বা তাঁহাকে করতলগত করিলেও করিতে পারেন, এ সন্দেহ অন্তঃপুরের অনেকের মনে স্থান পাইয়াছিল। এমন কি, তাঁহাদের এই নবানুরাগের কথা যথাসময়ে বাদশাহ্রও কানে উঠিল।

বিচক্ষণ বাদশাহ্ সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া, পুত্রের জন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ব্যাপারটা আর যাহাতে বেশী দূর গড়াইতে না পারে, তাই অবিলম্বে তিনি ঘিয়াসের সহিত পরামর্শ করিয়া, শের আফ্কন্ (ব্যাঘ্রহন্তা) নামক এক তুর্কী বীর কর্ম্মচারীর সহিত মিহ্রের বিবাহ দিলেন।* তার পর শেরকে বর্দ্ধমানের জাগীর দান করিয়া মিহ্রকে সলীমের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। পিতার এইরূপ আকস্মিক সতর্কতায় সলীম্ স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বাহিরে উত্তেজনার কোন ভাব দেখাইলেন না,—নীরবে দিনের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

---

* শের আফকন্ জাতিতে তুর্ক—'তুর্ক-ই-আস্তাজ্লু' (Khafi Kh. i. 265). আনুমানিক ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সহিত মিহ্রের বিবাহ হয়। মিহ্রের বয়স তখন ১৭।১৮; শাহ্জাদা সলীম্ তখন ২৪।২৫ বৎসরের যুবক।

২

মিহ্‌র-উন্নিসা—সম্রাজ্ঞী নূরজাহান্‌

বাদশাহ্‌ আক্‌বর মিহ্‌রকে শের আফ্‌কনের পত্নীরূপে দূরদেশে পাঠাইয়া মনে করিলেন, এবার একটা বড় চাল চালিলেন,—সলীমের হৃদয় হইতে এইবার মিহ্‌রের রূপের মোহ ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইবে। কিন্তু চালের উপরেও যাঁহার চাল, সেই সর্ব্বদর্শী ভাগ্য-বিধাতা আড়ালে বসিয়া যে অলঙ্ঘ্য চাল চালিয়াছিলেন, চতুরচূড়ামণি হইয়াও আকবর তাহার রহস্য বুঝিতে পারিলেন না। বিবাহ-বন্ধন, অদর্শন, স্থানের দূরত্ব—এই তিন বাধা সলীমের প্রেমকে মন্দীভূত না করিয়া বরং আরও উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিল। যৌবন-স্বপ্ন সফল করিয়া তুলিবার জন্য তিনি অনন্যমনে চিন্তার জাল বুনিতে লাগিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, ৩৭ বৎসর ৩ মাস বয়সে সলীম্‌ 'জহাঙ্গীর'—কি না ভুবনবিজয়ী—নাম লইয়া সিংহাসনে বসিলেন (অক্টোবর ১৬০৫); কিন্তু নিজ হৃদয় জয় করিতে পারিলেন না। মিহ্‌র—মিহ্‌র—এখনও সেই মিহ্‌র। নন্দনের কুসুম-সৌন্দর্য্যে তাঁহার হারেম পরিপূর্ণ, কিন্তু সেখানে সে পারিজাত কই? বৃথা দিল্লীর সিংহাসন, বৃথা মোগল-সাম্রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য, বৃথা তাঁহার জীবন-ধারণ;—যেমন করিয়াই হোক, মিহ্‌রকে লাভ করা চাই।
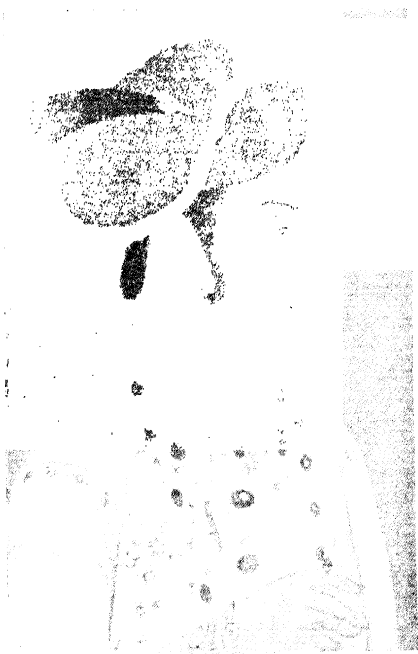
জহাঙ্গীর

সম্রাট্ তাঁহার দুধভাই কুতব্‌উদ্দীন্ খাঁকে তাড়াতাড়ি বাংলার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন, আর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কার্য্যক্ষেত্রে যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে গোপনে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। কুতব্‌উদ্দীন্ বাংলায় পৌঁছিয়া শের আফকন্‌কে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কয়েকখানি পত্র লিখিলেন।

অন্যান্য উচ্চপদস্থ প্রাদেশিক কর্ম্মচারীর ন্যায় শের আফ্‌কনও রাজসভার সকল ঘটনার সংবাদ নিয়মিতরূপে রাখিতেন। সুতরাং বাদশাহ্ জহাঙ্গীরের গোপন অভিসন্ধি টের পাইতে তাঁহার বেশী বিলম্ব হয় নাই। আর কি অবস্থায়, কি কারণে তাঁহার সহিত মিহ্‌রের বিবাহ হয়, কেনই বা তাঁহাকে রাজধানী হইতে এত দূরে পাঠান হইয়াছিল, সে কথাও ত তাঁহার অবিদিত ছিল না। তবে এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, বিবাহের পর মিহ্‌রের কাজে বা ব্যবহারে শেরের মনে ক্ষোভের কারণ হয় নাই, বরং সন্তোষের কারণই হইয়াছিল এবং উভয়ের দাম্পত্যজীবন যে বেশ সুখেই কাটিতেছিল, ইতিহাস-পাঠে ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

পত্রের পর পত্র লিখিয়াও শেরের যখন সাক্ষাৎ মিলিল না, কুতব উদ্দীন্ তখন নিজেই একদিন সরকারী-কাজের ভানে তাঁহার জাগীরে আসিয়া হাজির! শের অঙ্গরাখার নীচে বর্ম্ম পরিয়া, জনকয়েক বিশ্বাসী অনুচর সঙ্গে লইয়া সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কুতব্ উদ্দীন্ তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, নানা কথার পর, বাদশাহ্‌র আযৌবন-পোষিত অভিলাষ তাঁহার নিকট

ব্যক্ত করিয়া, তাঁহাকে পত্নীত্যাগ করিতে বলিলেন। বীরবর শের এই ঘৃণিত প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; কিন্তু বুঝিলেন, এখানে কথায় ক্রোধ প্রকাশ করা বৃথা, কিছুতেই মান লইয়া ঘরে ফেরা যাইবে না। মানরক্ষার একমাত্র উপায়—কুতবকে মারিয়া, তাঁহার সৈন্যগণের সঙ্গে লড়াই করিয়া বীরের মত প্রাণদান। আত্মরক্ষার জন্য তাঁহার আস্তিনের নীচে লুকান একখানা ছোরা ছিল, তাহাই বাহির করিয়া সজোরে বসাইয়া দিলেন—কুতবের পেটে। মরণাহত কুতব ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেলেন। কিন্তু শের আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না;—কুতবের লোকজনের হাতে নিহত হইলেন (মে ১৬০৭)।* শের আফকনের সমাধি বর্দ্ধমানে এখনও বর্ত্তমান।†

সদ্যোবিধবা মিহ্‌রের পতিশোকাবেগ কতকটা প্রশমিত হইবার পূর্ব্বেই সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে বন্দিভাবে রাজধানীতে যাইতে হইল। বহুদিন পরে আবার মিহ্‌রকে দেখিয়া—তাঁহার পরিপূর্ণ যৌবন-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া জহাঙ্গীরের হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। এত দিন যাঁহাকে তিনি ধ্যান করিয়া আসিতেছেন—হৃদয়ের নিভৃত সিংহাসনে বসাইয়া প্রেমের পুষ্পচন্দনে পূজা করিতেছেন,—সেই আকাঙ্ক্ষার বস্তু তাঁহার সম্মুখে। তাঁহার পক্ষে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকা

---

* নূরজহানের বাল্যজীবন ও শের আফকনের সহিত বিবাহের কথা, খাফি খাঁর 'মুন্তখাব্-উল্-লবাব' (Pers. Text, i. 263-6) অবলম্বনে লিখিত।

† Maulvi Abdul Wali : Antiquities of Burdwan, Traditions etc. and Sher Afgan's tomb, *J. A. S. B.*, 1917, pp. 184-86.

অসম্ভব। তিনি অবিলম্বে মিহ্রের নিকট বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক,—মিহ্র পদদলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন,—'আমি বিচার চাই। যে-ব্যক্তি আমার স্বামি-হত্যার কারণ, তাহার উপযুক্ত বিচার আমি সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করি।'

সত্য বটে, প্রথম যৌবনে মিহ্রের হৃদয়ে শাহ্জাদা সলীমের প্রতি প্রেমসঞ্চার হইয়াছিল এবং যুবরাজও তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন; কিন্তু প্রথম যৌবনের সে সুখস্বপ্ন ভাঙিলে মিহ্র স্বামীকে সত্য সত্যই প্রেমের অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়; তাই তিনি তাঁহার শোকে মুহ্যমান হন। যে স্বামি-সাহচর্যে এত দিন মিহ্র সুখে কাল কাটাইয়াছেন—যে বিবাহের ফলে আজ তিনি মাতৃত্বের অধিকার লাভ করিয়াছেন, সেই স্বামীর কথাই তখন তাঁহার হৃদয়ে বেশী করিয়া উদিত হইল। তাঁহার স্বামী যদি কোন রোগে দেহত্যাগ করিতেন, তাহা হইলেও বিধাতার অব্যর্থ বিধান বলিয়া তিনি এই শোকভার বহন করিয়া ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইতে পারিতেন; কিন্তু কি ভাবে, কি কারণে তাঁহার স্বামীর অকালে জীবনান্ত হইল, তাহা তিনি সকলই বুঝিতে ও জানিতে পারিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোক যাহা করিতে পারে,—করিয়া থাকে, তিনি তাহাই করিলেন;—সম্রাটের নিকট স্বামি-হত্যার বিচার প্রার্থনা করিলেন।

এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে জহাঙ্গীরের মনে একটা দারুণ

আঘাত লাগিল। তিনি নিশিদিন যাহার প্রেমে মশগুল্, যাহাকে পাইবার জন্য তিনি অবৈধ উপায়কেও বৈধ বলিয়া মনে করিয়াছেন,—সেই তাঁহার একান্ত প্রিয়বস্তু তাঁহারই সম্মুখে, বক্র তীব্র দৃষ্টি হানিয়া, তাঁহার কৃত কর্ম্মের কৈফিয়ৎ চাহিতেছে! জহাঙ্গীর স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, কিন্তু ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না।

জহাঙ্গীর অবিবেচক নন, তার পর তিনি মিহ্‌রকে সত্য সত্যই ভালবাসেন। আঘাতের বেদনা প্রশমিত হইলে, ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, মিহ্‌র শোকবিহ্বলা—এ অবস্থায় তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তিনি ভাল করেন নাই। যাই হোক্, এই ঘটনার পর হইতে চতুর সম্রাট্ মিহ্‌রের কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলিলেন—অন্ততঃ সেইরূপ ভাবই দেখাইতে লাগিলেন। মিহ্‌র উপেক্ষিতার ন্যায় বাদশাহ্‌র বিমাতার নিকট রহিলেন।

সম্রাট্ও মিহ্‌রের খবর রাখেন না; মিহ্‌রও কোন দিন তাঁহার অনুগ্রহলাভের বা দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইবার কোনরূপ চেষ্টা বা আগ্রহ প্রকাশ করেন না। এম্‌নি করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতে লাগিল। কালের মত বেদনা-প্রশমনকারী মহৌষধ জগতে আর কিছুই নাই। যতই দিন যাইতে লাগিল, মিহ্‌র স্বামীর কথা—দাম্পত্যজীবনের অতীত কাহিনী—ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন, আর তাঁহার হৃদয় জিতিয়া লইল বর্ত্তমান—ভারত-সাম্রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য, সম্রাটের অপরিমিত প্রেম। যে চলিয়া গিয়াছে, সে আর ফিরিবে না; কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলেই

ভারতেশ্বরের হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরী হইতে পারেন। যিনি হৃদয়-রাজ্যের অধিকারিণী, বাহিরের রাজ্য করতলগত করিতে তাঁহার কতক্ষণ? আশা-বিমুগ্ধ মিহ্‌র তাই একদিন যাঁহার উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন, আর একদিন তাঁহার উপর তুষ্ট হইয়া অভিমান করিলেন। মনের দুঃখে তিনি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এম্‌নি অবস্থায়—রাজধানীতে আসিবার প্রায় চার বৎসর পরের কথা—সম্রাট্ একদিন তাঁহাকে দেখিলেন, যেন আকাশের ক্ষীয়মান চন্দ্র কারুণ্যে লাবণ্যে ঝলমল্। সম্রাটের অন্তঃপুর রূপের হাট সন্দেহ নাই, কিন্তু সে রূপের হাটে এমন রত্ন আর একটিও নাই, ইহাই সম্রাট্ জানিতেন; কিন্তু আজ তাঁহার মনে হইল, শুধু তাঁহার অন্দরে নয়, জগতের রূপের হাটেও এ নারীরত্ন অতুল্য। অদর্শনে যে মন তাঁহার এত দিন কোনক্রমে ধৈর্য্য ধরিয়া ছিল, আজিকার এই দর্শন তাঁহার সেই মনের বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া-চুরিয়া ভাসাইয়া দিল। প্রেমার্দ্র অনুতপ্ত সম্রাট্ আবার মিহ্‌রকে ডাকাইয়া পরিণয়ের অনুমতি চাহিলেন।

সেদিন ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে নববর্ষের উৎসব। নবহতে আনন্দের সুর বাজিতে সুরু হইয়াছে। অভিমানিনী মিহ্‌র প্রেমাশ্রু-নয়নে সম্রাটের মুখের দিকে চাহিলেন। নীরব ভাষায় সম্রাট্ তাঁহার অনুমতি পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেলেন। তাহার পর যথাসময়ে মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল (১৬১১, মে)। মিহ্‌রের বয়স তখন প্রায় ৩৬, জহাঙ্গীরের ৪২! মিহ্‌র-উন্নিসা এত দিনে ভারতের

অধীশ্বরী হইলেন—তাঁহার নাম হইল, নূরজহান্*—অর্থাৎ 'জগতের আলো।'

এই সময় হইতে নূরজহানের কথা বলিতে হইলে জহাঙ্গীরের রাজত্বের ইতিহাসই বলিতে হয়। সে রাজত্বের সমুদয় রাজকার্য্যের ভার ক্রমে ক্রমে নূরজহানের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছিল।

* বিবাহের পরে কিছু দিন মিহ্‌র-উন্নিসা 'নূরমহল' (পুরীজ্যোতিঃ) নামে অভিহিতা হইয়াছিলেন। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে অর্থাৎ বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে, বাদশাহ্ তাঁহার নাম রাখেন—নূরজহান্।

৩

নূরজহানের রাজনীতি* ; শাহ্‌জহানের সহিত সঙ্ঘর্ষ

নূরজহান্‌কে বিবাহ করিবার পর যতই দিন যাইতে লাগিল, সম্রাট্‌ জহাঙ্গীর ততই রাজ্ঞীর বশীভূত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শয়নে স্বপনে জাগরণে নূরজহান্‌ না হইলে তাঁহার চলিবার উপায় নাই। রাজকার্য্যে মন দিবার অবসর তাঁহার অতি অল্প। কিন্তু মরুনন্দিনী নূরজহান্‌ শুধু প্রেমের বস্তুতন্ত্রহীন কল্পনা-রাজ্যে বিচরণ করিবার জন্যই সম্রাট্‌কে বরমাল্য অর্পণ করেন নাই। তিনি সম্রাট্‌কে কর্ম্মবিমুখ দেখিয়া, তাঁহার কর্ম্মভার ধীরে ধীরে নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্‌ও অবসর পাইলে—যোগ্যহস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতে পারিলে—স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িতে পারেন। একে একে সমস্ত দায়িত্ব-ভারই পত্নীর হাতে তুলিয়া দিয়া অবশেষে তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। ইহা শুধু রূপজ মোহের কার্য্য নহে—গুণের প্রতিও সম্মান। জহাঙ্গীর নূরজহানের রূপে মুগ্ধ ছিলেন, এ কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না; কিন্তু রূপ যত বড়ই হোক না কেন, সে বেশী দিন মানুষকে

---

* Gladwin's *Reign of Jahangir*, pp. 57-60, 62 ; *Iqbalnama-i-Jahangiri* (Pers. text) pp. 194-96 ; Wm. Irvine's Life of Aurangzeb, *Indian Antiquary*, 1911, p. 69.

অভিভূত করিয়া রাখিতে পারে না, একদিন না একদিন তাহার নেশা ছুটিয়া যায়। জহাঙ্গীরের রূপের মোহও একদিন নিশ্চয়ই ছুটিয়া যাইত,—যদি না নূরজহানের অসাধারণ গুণ, বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম্মদক্ষতা বাদশাহ্‌র অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিত।

জহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারম্ভেই নূরজহানের পিতা ঘিয়াস বেগ 'ইৎমদ্‌-উদ্দৌলা' আখ্যালাভ করেন। তার পর কন্যার সহিত বাদশাহ্‌র বিবাহ হইলে তিনি 'বকিল্‌-ই-কুল' ('সর্ব্বকর্ম্মে সম্রাটের প্রতিনিধি') পদ পান—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্র আসফ্‌ খাঁরও পদোন্নতি ঘটে। ইৎমদ্‌-উদ্দৌলা যত দিন বাঁচিয়াছিলেন, তত দিন রাজ্য-শাসনের অনেকটা ভার তাঁহারই হাতে ছিল। তাঁহার মৃত্যুর (১৬২২, জানুয়ারি) পর নূরজহানের ক্ষমতা অসীম হইল*—জহাঙ্গীর নামেমাত্র সম্রাট্‌ রহিলেন; সমস্ত রাজকার্য্য তিনিই দেখিতে লাগিলেন।

তখন অতিমাত্রায় সুরাপায়ী সম্রাটের স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙিয়া পড়িতেছে—নূরজহান্‌ একটু চিন্তিত হইলেন। হইবারই কথা।

---

* "I gave the establishment and everything belonging to the Government and Amirship of Itimadu d-daulah to Nur Jahan Begam and ordered that her drums and orchestra should be sounded after those of the king.' *Tuzuk-i-Jahangiri*, ii. 228.
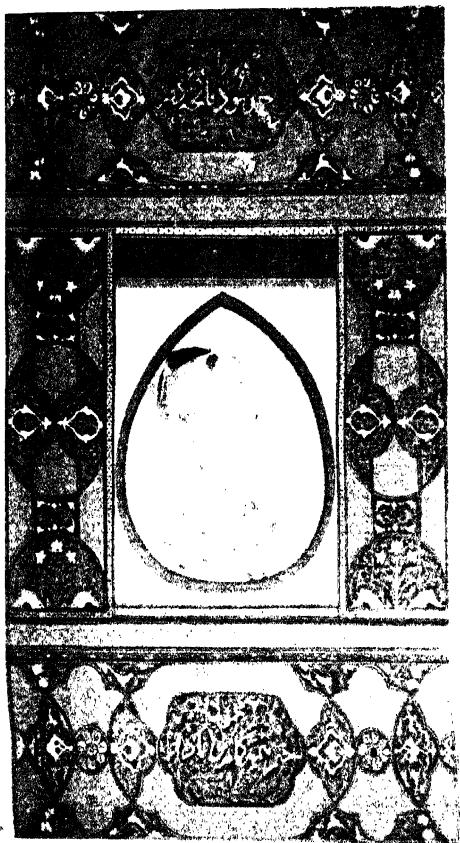
শাহ্‌জাদা শাহ্‌জহান্* দিন দিন যেরূপ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিতেছেন, রাজপুতদিগকে পরাজিত করিয়া এবং দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ দমন করিয়া যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সম্রাটের মৃত্যুর পর এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য যে তাঁহারই হইবে, ইহা নূরজহান্ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। শাহ্‌জহান্ সিংহাসন লাভ করিলে নূরজহানের সমস্ত ক্ষমতা নিমেষে অন্তর্হিত হইবে। এখন হইতেই সাবধান হইয়া আত্মপ্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা না করিলে ভবিষ্যতে তিনি কোথায় তলাইয়া যাইবেন, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। তাই তাঁহার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য হইল—শাহ্‌জহানের ক্ষমতা লোপ করা। এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য তিনি নানা উপায়-উদ্ভাবনে তৎপর হইলেন।

শাহ্‌জহান্‌কে খর্ব্ব করিতে হইলে রাজসিংহাসন করায়ত্ত রাখিয়া, তাঁহার রাজশক্তি নির্ম্মূল করা আবশ্যক। কিন্তু একটা উপযুক্ত অবলম্বন না হইলে ত তাহা হইতে পারে না। অবলম্বন যে তাঁহার একেবারে নাই, তাহা নহে; কিন্তু সেটা নিতান্তই ক্ষীণ হইলেও নিজের ক্ষমতার উপর নূরজহানের অপরিসীম বিশ্বাস ছিল; সুতরাং উহা লইয়াই তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই অবলম্বন আর কেহ নয়—সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র শহ্‌রিয়ার। কিছু দিন পূর্ব্বে (১৬২১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে) শাহ্‌জাদার সহিত

---

* ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে খুর্‌রমের দাক্ষিণাত্য-অভিযানকালে বাদশাহ্ জহাঙ্গীর পুত্রকে 'শাহ্' উপাধিতে ভূষিত করেন। দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কে (১৬১৭) শাহ্ সুলতান্ খুর্‌রম্ সম্রাটের নিকট হইতে 'শাহ্‌জহান্' উপাধি লাভ করেন।

নূরজহান্ তাঁহার পূর্ব্বস্বামী শের আফ্কনের ঔরসজাত-কন্যা—লড়িলীর বিবাহ দিয়াছিলেন। সম্রাজ্ঞী এখন জামাতার স্বার্থ-চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া, তাহারই রাজ্যপ্রাপ্তির উপায় স্থির করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি জানিতেন, শহ্রিয়ার জহাঙ্গীরের পুত্র-গণের মধ্যে অধম—তাহার বুদ্ধি-সুদ্ধি নিতান্তই অল্প। লোকে তাহার নাম রাখিয়াছিল—'না-সুদনি' কি না, 'কুচ কাম্কা নহি'। নূরজহান্ এই দুর্ব্বল 'না-সুদনি'র পক্ষ অবলম্বন করার একটা বিশেষ সুবিধাও বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তায় শহ্রিয়ার রাজ্যলাভ করিলে, সে যে তাঁহার হাতের পুতুল হইয়া থাকিবে;—সকল বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইবে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; তাহা হইলেই শহ্রিয়ারকে নামেমাত্র সম্রাটের পদে বসাইয়া তিনিই সমস্ত শাসন-ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন। জহাঙ্গীরকে তিনি যে-ভাবে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যে ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিবেন—এ বিশ্বাসও তাঁহার ছিল। নূরজহান্ সম্রাটের নিকট অবিরত শাহ্জহানের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে লাগিলেন।

১৬২২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পারস্যাধিপতি প্রথম শাহ্ আব্বাস মোগলদের হাত হইতে কন্দাহার কাড়িয়া লইলেন। জহাঙ্গীর শাহ্জহান্‌কেই কন্দাহার-অভিযানে পাঠাইবেন সাব্যস্ত করিলেন। তখনই সৈন্যসামন্ত সহ দরবারে ফিরিয়া আসিবার জন্য জৈন্-উল্-আবেদীনের দ্বারা শাহ্জাদাকে দাক্ষিণাত্যে খবর পাঠান হইল। কিছু দিন পরে লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, শাহ্জহান্

মালবের মাণ্ডুতে পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু সম্মুখে বর্ষা; বর্ষাটা সেখানে কাটাইয়া তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। শাহ্‌জহান্‌ও পিতাকে পত্রে জানাইয়াছিলেন,—'আমাকে রাজ-সরকার হইতে কোনরূপ সৈন্য-সাহায্য করিতে হইবে না। বাদশাহ্ যদি ভরসা করিয়া কন্দাহার-অভিযানের সমস্ত ভারই আমার উপর ছাড়িয়া দিতে পারেন, তবে এ যুদ্ধে জয়লাভ সুনিশ্চিত।'

নূরজহান্ সম্রাট্‌কে বুঝাইয়া দিলেন যে, শাহ্‌জহান্ কন্দাহার-অভিযানে সৈন্যদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব-গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে—পিতাকে সিংহাসন-চ্যুত করা। নূরজহানের প্রিয়পাত্রেরাও সম্রাট্‌কে এই কথাই বুঝাইতে লাগিল। জহাঙ্গীর প্রথমে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কিন্তু নূরজহান্ ক্রমাগত যুক্তিতর্কের দ্বারা যখন শাহ্‌জহানের কাজের ও ব্যবহারের অপব্যাখ্যা করিয়া দুরভিসন্ধি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন মোহান্ধ সম্রাট্ বেগমের কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। নূরজহানের অভীষ্ট-সিদ্ধির পথ সুগম হইল। এইরূপে তিনি সম্রাটের মনে সন্দেহ জন্মাইয়া প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার জামাতা শাহ্‌জাদা শহ্‌রিয়ারকেই কন্দাহার-অভিযানের সমস্ত কর্তৃত্ব প্রদান করা হউক। তাহা হইলে এ-যাবৎ নূরজহান্ সম্রাটের অনুগ্রহে যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছেন, পিতার সম্পত্তি বাবদ যাহা কিছু করিয়াছেন, সমস্তই তিনি স্বেচ্ছায় এই অভিযানের ব্যয়স্বরূপ দান করিবেন। বেগম সম্রাট্‌কে আরও একটি অনুরোধ জানাইলেন। আগ্রা, আজ্‌মীর

ও লাহোরে শাহ্‌জহানের যে-সব জাগীর আছে, তাহা শহ্‌রিয়ারকে দেওয়া হউক; শাহ্‌জহান্‌ ইচ্ছা করিলে এই পরিমাণ মূল্যের জাগীর দাক্ষিণাত্য, মালব ও গুজরাট হইতে লইতে পারিবে। সে যখন সম্রাটের বিরুদ্ধাচারী, তখন তাহাকে যতই দূরে রাখা যায়, ততই মঙ্গল।

সম্রাট্‌ এই সকল কথা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া বুঝিলেন। নূরজহান্‌ যে স্বার্থপ্রণোদিত না হইয়া, সম্রাটের মঙ্গলের জন্যই এই প্রস্তাব করিতেছেন, জহাঙ্গীরের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হইল। তিনি ন্যায়বান্‌ উপযুক্ত পুত্রের স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া প্রিয়তমা মহিষীর পরামর্শেরই অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

যথাসময়ে শাহ্‌জহান্‌কে আগ্রা, আজমীর এবং লাহোরের জাগীর হস্তান্তর করিবার কথা জানান হইল। আর তাহার কন্দাহার-অভিযানের আদেশ নাকচ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল, সঙ্গে যে-সব সৈন্যসামন্ত আছে, তাহা দরবারে পাঠাইয়া দিয়া সে যেন দাক্ষিণাত্যে চলিয়া যায়। ব্যাপার কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে। নূরজহান্‌ ও পিতার অভিসন্ধি যখন শাহ্‌জহান্‌ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই, তখন তিনি আগ্রার দক্ষিণে অবস্থিত ঢোলপুর নিজের জাগীরভুক্ত করিয়া লইবার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন, আর পিতা যে তাঁহার এ অনুরোধ রক্ষা করিবেন, ইহা নিশ্চিত জানিয়া সম্রাটের অনুমতি পাইবার পূর্ব্বেই স্বীয় প্রতিনিধি দরিয়া খাঁর সহিত কয়েক জন লোক ঢোলপুরে পাঠাইয়া দেন। এদিকে শহ্‌রিয়ারের পক্ষের

শরীফ্-উল্-মুল্কও তথায় গমন করে, ফলে দুই পক্ষের লোকজনের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। কিন্তু শরীফের সুবিধা হইল না—বিপক্ষের একটা তীর লাগিয়া তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল।

এই ঘটনায় পুত্রের উপর জহাঙ্গীরের সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। তিনি বুঝিলেন, শাহ্জহানের মতলব ভাল নহে,—নূরজহান্ যাহা বলিয়া আসিতেছেন, তাহাই ঠিক। সেই দিন হইতে জহাঙ্গীর পুত্রের নাম রাখিলেন—'বেদৌলৎ' কি না, ভাগ্যহীন।

শাহ্জহান্ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন; তিনি সরল বিশ্বাসী, পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্, পিতা রুষ্ট হন, ইহা তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত নহে। শাহ্জহান্ তাঁহার দেওয়ান্ আফজল্ খাঁর হাত দিয়া রাজদরবারে এক আরজী পেশ করিলেন। ইহাতে তিনি পিতার নিকট হইতে সম্প্রতি যে ব্যবহার লাভ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে একটু অনুযোগও করিলেন, এবং নিজে যাহাতে উপস্থিত হইয়া বাদশাহ্র নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারেন, তাহার অনুমতি চাহিলেন। জহাঙ্গীর পুত্রের এই আবেদন মঞ্জুর করিলেন না। "আফজল্ খাঁ এই গোলযোগ মিটাইবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেন। নূরজহান্ তাঁহাকে কথা বলিবার অবকাশটুকু না দিয়াই বিদায় দিলেন।" (*Iqbalnama*, Text, pp. 195-6.)

সম্রাট্ নূরজহানের এতই বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন—তাঁহার পরামর্শ এমনই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছিলেন যে, প্রিয়মহিষীর কথায় তিনি পুত্রের উপর আরও একটু অবিচার করিলেন। হিসার,

মিয়ান্-দুয়াব ও অন্যান্য স্থানে শাহ্জহানের যে কয়টি জাগীর অবশিষ্ট ছিল, তাহাও শহ্রিয়ারের জাগীরভুক্ত করিয়া দিলেন।

শাহ্জহানের উপর এই সমস্ত অযথা অত্যাচার করিয়া নূরজহান্ লক্ষ্য করিতেছিলেন—শাহ্জাদা কোন্ পথ অবলম্বন করেন। যদি তিনি এই দুর্ব্ব্যবহার অম্লানবদনে পরিপাক করিয়া দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, তাহা হইলে ত অনায়াসেই নূরজহানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়,—তিনি তাহাকে পদানত করিয়া যাহা খুশী তাহাই করিতে পারেন। আর যদি তিনি বিদ্রোহী হন, তাহা হইলেও নূরজহানের আশঙ্কা নাই,—পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি লোকের অশ্রদ্ধার পাত্র হইবেন, আর নূরজহান্ও স্বীয় অর্থ ও লোকজনের সাহায্যে তাঁহাকে খর্ব্ব করিতে পারিবেন।

কিন্তু পিতৃভক্ত শাহ্জহান্ কিছুতেই বিবাদে জড়িত হইতে চাহেন না—সাবধানে বিবাদ এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। নূরজহান্ পিতা ও পুত্রের মধ্যে ঘোর বিরোধ জন্মাইয়া দিবার নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, উদ্দেশ্য সেই এক—শাহ্জহানের পরিবর্ত্তে নিজ জামাতা শহ্রিয়ারের উত্তরাধিকারের ভিত্তি পাকা করিয়া, নিজের ক্ষমতা অটুট অক্ষুণ্ণ রাখা।

আফজল্ খাঁ দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গিয়া সকল কথা শাহ্জহানের গোচর করিলেন। সম্রাট্ এ-যাবৎ যে-সকল অন্যায় আদেশ করিয়াছেন, তাহার কারণ যে নূরজহান্ এবং তাঁহার প্রিয়পাত্র-

গণের চক্রান্ত, ইহা তিনি শাহ্‌জাদাকে ধীরভাবে বুঝাইয়া, তাহার পর বলিলেন যে, এখন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অনুযোগ-অনুশোচনায় কোন ফল হইবে না ; আবার বশ্যতাস্বীকার করিলেও তাঁহাকে নিশ্চয়ই ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। সম্প্রতি তিনি আগ্রা, লাহোর প্রভৃতি স্থানের জাগীরগুলি যেরূপে হারাইয়াছেন, কিছু দিন পরে মালব, গুজরাট, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতির জাগীরগুলিও সেইরূপে তাঁহার হস্তচ্যুত হইবে। শেষে সর্ব্বপ্রকারে অসহায় হইয়া তাঁহাকে মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। শাহ্‌জহান্ দেওয়ানের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিলেন, এবং নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য অসি গ্রহণ করিতে হইল। অবিলম্বে তিনি নর্ম্মদা অতিক্রম করিয়া (১৬২৩) আসীর-দুর্গ অধিকার করিলেন, এবং তাহার পর বুর্হানপুরে গমন করিলেন।

বিদ্রোহী পুত্রকে বাধা দিবার জন্য সম্রাট্ তুর্কী-সেনাপতি মহাবৎ খাঁ ও পুত্র পরবেজকে পাঠাইলেন। সম্রাট-প্রেরিত সেনাসামন্তের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শাহ্‌জহানকে গোলকুণ্ডায় প্রস্থান করিতে হয় ; তাহার পর তিনি উড়িষ্যা হইয়া বাংলায় আসেন। ক্রমে পাটনার দিকে অগ্রসর হইয়া রোটাস্-দুর্গ অধিকার করেন ; কিন্তু ইহাও তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না—এলাহাবাদের নিকট পরাজিত হইয়া পরিবারবর্গ ও শিশুপুত্র মুরাদকে রোটাসে রাখিয়া, প্রিয়তমা পত্নী মুমতাজ-মহলকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল (১৬২৪-২৫)।

পঞ্জাবের উত্তরে রাজা বসুর পুত্র জগৎসিংহও এই সময় 'বেদৌলতে'র প্ররোচনায় মৌ-এর দুর্গ সুদৃঢ় করিয়া সম্রাট্-প্রেরিত সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করেন। কিন্তু তিনিও শেষরক্ষা করিতে পারেন নাই। অল্প দিন পরেই রসদের অভাবে নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে নূরজহানের নিকট নিজ দুষ্কৃতির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হয়। নূরজহান্ ইহাতে প্রসন্ন হইলে, সম্রাট্ জহাঙ্গীর জগৎসিংহকে ক্ষমা করিয়া বেগমের মনোরঞ্জন করেন (*Tuzuk*, ii. 289.)

নানা স্থানে পরাজিত হইয়া শাহ্‌জহান্ পিতার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট্ স্বহস্তে পত্র লিখিয়া শাহ্‌জহান্‌কে জানাইলেন, যদি তিনি তাঁহার দুই পুত্র—দারা ও আওরংজীবকে প্রতিভূস্বরূপ দরবারে পাঠাইতে পারেন, এবং তাঁহার লোকজনকে রোটাস্ ও আসীর দুর্গ ত্যাগ করিতে আদেশ দেন, তবেই তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবে। বলা বাহুল্য, শাহ্‌জহান্ পিতার আদেশমত কার্য্য করেন। দারা ও আওরংজীব পিতার প্রতিভূস্বরূপ ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর পৌছিয়া নূরজহানের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হন।

৪

মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ; সম্রাটের মুক্তি

নূরজহান্ শাহ্জহান্‌কে অনেকটা আয়ত্ত করিতে পারিলেও তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠা সুসম্পূর্ণ হয় নাই। এক দিকের চিন্তা দূরীভূত হইয়াছিল সত্য; কিন্তু আর এক দিকের চিন্তা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। এই চিন্তার কারণ—সেনাপতি মহাবৎ খাঁ। সম্রাটের আদেশে তিনি বাংলায় গিয়াছিলেন। এখানে তিনি জমিদারদের উপর নানা রকম অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়া জাগীর প্রভৃতি হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন। তাঁহার জোর-জবরদস্তির ফলে যখন দেশের চারি দিক্ হইতে আর্ত্তনাদ প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল, তখন সে সংবাদ সম্রাটের অগোচর রহিল না।

ইতিপূর্ব্বে মহাবৎ খাঁ বাদশাহ্‌র বিনা অনুমতিতে কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; তাহার পর বাংলায় তিনি যে-সব হাতী-ঘোড়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন,তাহা রাজসরকারে পাঠান নাই। এক্ষণে আবার এই প্রজাপীড়ন! সম্রাট্ রুষ্ট হইয়া অবিলম্বে মহাবৎকে দরবারে হাজির হইবার আদেশ করিলেন।

মহাবতের সহিত আসফ্ খাঁর পূর্ব্ব হইতেই মনোমালিন্য ছিল। আসফ্ নূরজহানের ভ্রাতা, 'লাহোরের সুবাদার—সম্রাটের বকিল্'

বা রাজপ্রতিনিধি। ক্ষমতা তাঁহার অসাধারণ। অন্য দিকে মহাবৎও সেনাপতি, এবং বীরের মত বীর। সুতরাং দুই প্রবল শক্তির বিরোধ অনিবার্য্য। আসফ্ তাঁহাকে দাবাইয়া পঙ্গু করিয়া রাখিতে পারিলে ছাড়েন না। মহাবৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সম্রাটের এই আদেশের মূলে আসফ্ খাঁর ইঙ্গিত আছে। সম্রাট্ও তাঁহার উপর প্রসন্ন নন; এই কারণে মহাবৎ ভাবী বিপদের আশঙ্কায় চারি পাঁচ হাজার রাজপুত-সৈন্য সঙ্গে লইয়া রাজদরবারের উদ্দেশে চলিলেন।

বাদশাহ্ জহাঙ্গীর তখন লাহোর হইতে কাবুলের পথে—ঝিলম্ নদীর পূর্ব্বতীরে পট্টাবাসে। * মহাবতের সহিত এত লোকলস্কর দেখিয়া আসফ্ খাঁর মনে সন্দেহ হইল। এ সময় একটা সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা। তাই তিনি পূর্ব্বেই সেতু পার হইয়া, নিজের শিবিরে প্রস্থান করিলেন। অনেক সৈন্য-সামন্তও সরঞ্জাম (কারখানা) আদি লইয়া নদী পার হইয়া গেল। জহাঙ্গীর নদীর পূর্ব্বতীরে প্রায় একেলা রহিলেন। সম্রাট্ ও নূরজহান্ যে আসন্ন বিপদের মুখে, এমন অরক্ষিত অবস্থায় যে তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অসঙ্গত, তাহা তিনি ভাবিয়াও দেখিলেন না।

পর দিন প্রাতঃকালে ঠিক এই সুযোগে মহাবৎ হঠাৎ সসৈন্য

* খুব সম্ভব নৌরঙ্গাবাদ নামক স্থানে। ইহার নিকটে পরে 'সরাই-আলমগীর' নির্ম্মিত হয়। লাহোর হইতে কাবুলে যাইবার বাদশাহী-পথ এখানে ঝিলম্ নদী অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আসিয়া সেতু অধিকার করিলেন ; সেতুরক্ষার জন্য তাঁহার দু-হাজার রাজপুত-সৈন্য মোতায়েন রহিল, আর চার-পাঁচ শত সৈন্য সহ তিনি বাদশাহ্‌র ছাউনীতে প্রবেশ করিয়া, সম্রাট্‌কে নজরবন্দী করিলেন। ক্রমে হাজার হাজার সশস্ত্র রাজপুত আসিয়া তাঁবু ঘিরিয়া ফেলিল। গোলমালে নূরজহান্ বেগমের কথাটা মহাবতের মনে হয় নাই। একটু পরেই মনে হওয়ায়, শঙ্কিত হইয়া তাঁহার খোঁজ করিলেন। সন্ধান মিলিল না—শিকার তখন হাতছাড়া হইয়া পলাইয়াছে! ইহা চিন্তার কথা হইলেও আপাততঃ সম্রাট্‌কে যে হাত করা হইয়াছে, ইহাই যথালাভ মনে করিয়া মহাবৎ তাঁহাকে লইয়াই নিজের আবাসে ফিরিলেন।

নূরজহান্ যখন দেখিলেন যে, মহাবৎ ও তাঁহার দলবল সম্রাট্‌কে বন্দী করিয়া, শিকারে যাইবার ছলে বাহির হইতেছে, তখন সেই অবসরে তিনি এক জন খোজার সঙ্গে বেমালুম সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার পলায়নের উদ্দেশ্য, শুধু নিজে মুক্ত হওয়া নহে, —সম্রাট্‌কেও মুক্ত করা। তিনি নদী পার হইয়া, আর কোথাও না গিয়া বরাবর ভ্রাতা আসফের আবাসে গিয়া হাজির। রাগে তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে। রাগ শুধু মহাবতের উপরে নহে, তাঁহার নিজের লোকজনের—বিশেষতঃ ভ্রাতা আসফ্ খাঁর উপরে। তিনি ভাইকে ও উপস্থিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন,—'কোন দিন যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, তোমাদের দোষে আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইল। সম্রাট্ আজ মহাবতের হাতে বন্দী! আর তোমরা তাহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা না

করিয়া, কাপুরুষের মত ঘরের কোণে আশ্রয় লইয়াছ! বাঁচিয়া থাকিতে তোমাদের লজ্জা হয় না? যদি লোকসমাজে মুখ দেখাইতে চাও—অপরাধের যদি প্রায়শ্চিত্ত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আর সময় নষ্ট করিও না, প্রতীকারের জন্য সচেষ্ট হও; অসিহস্তে সমরাঙ্গণে অবতরণ কর।'

নূরজহানের কথায় সকলেই যে শুধু লজ্জিত হইলেন, তাহা নহে, তাঁহারা বিদ্রোহী মহাবৎকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্থির হইল, পর-দিন পাখীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই রণক্ষেত্রে অবতরণ করা হইবে।

বাদশাহ্ জহাঙ্গীর গোপনে এই সংবাদ শুনিয়া নূরজহান্ ও আসফ্ খাঁকে তাঁহাদের সঙ্কল্প হইতে বিরত করিবার জন্য অবিলম্বে স্বীয় নামাঙ্কিত অঙ্গুরী তাঁহাদের নিকট পাঠাইলেন; আর জানাইলেন যে, তিনি এখন শত্রুহস্তে; এ অবস্থায় যদি তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার জীবন-সংশয়ের যথেষ্ট সম্ভাবনা।

আসফ্ খাঁর সন্দেহ হইল—মহাবৎ হয়ত সম্রাট্‌কে বাধ্য করাইয়া এরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন। সুতরাং তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তিনি সম্রাট্‌কে উদ্ধার করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

স্বামিগতপ্রাণ নূরজহান্ নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক নহেন; পর-দিন স্বামীকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং যুদ্ধে যোগদান করিবেন স্থির হইল।

নূরজহান্ যে সম্রাটের মুক্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন, তাহা মহাবৎ পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি পারাপারের সেতুটি পুড়াইয়া বিপক্ষের বিপদের পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিলেন।

১০ই মার্চ (১৬২৬) প্রাতে আসফ্ ও অন্যান্য সেনাসামন্ত নদী পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাদশাহী-সৈন্যের প্রধান ভাগের পরিচালন-ভার বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি—আসফ্, অন্যান্য উমারা, এবং স্বয়ং নূরজহান্—গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা শত্রুর সর্ব্বপ্রধান দলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। হাঁটিয়া নদী পার হইবার জন্য নৌ-বিভাগের অধ্যক্ষ ঘাজী বেগ একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই স্থানে নদীগর্ভ অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাহার কোথাও কোথাও ডুব-জল। অপরাপর সেনাপতিরা এখান হইতে আরও ভাটিতে দূরে দূরে গিয়া নদী পার হইতে লাগিলেন। এই কারণে বাদশাহী-সৈন্য একসঙ্গে শৃঙ্খলার সহিত শত্রুর সম্মুখীন হইতে পারিল না, অনেকে আবার জলে ভিজিয়া অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পরপারে পৌঁছিল।

অপর পারে মহাবতের সৈন্যগণ সশস্ত্র, শ্রেণিবদ্ধভাবে হস্তিপৃষ্ঠে অবস্থান করিতেছে। আক্রমণকারী বাদশাহী-সৈন্য নিম্নভূমি হইতে তাহাদের কিছুই করিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে মহাবতের গজারোহী সেনাদল মহাবিক্রমে অগ্রসর হইয়া নূরজহানের সেনাদলকে আক্রমণ করিল। এ আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না; তাহাদের

কতক মরিল, কতক ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মহাবতের রাজপুত-সৈন্যেরা তখন চারি দিক্ হইতে বেগমের হাতী ঘেরাও করিয়াছে। নূরজহানের হাওদায় তাঁহার জামাতা শহ্‌রিয়ারের শিশুকন্যা ছিল। এই সময় শিশুর ধাত্রীর হস্তে তীর আসিয়া বিঁধিল। নূরজহান্ স্বয়ং তাহা টানিয়া বাহির করিয়া দিলেন—তাঁহার বস্ত্র রক্তে লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহাতেও তিনি ভীত হন নাই। তাঁহার হাতীর সম্মুখে চারি জন খোজা পদাতিক ছিল, তাহারা প্রাণপণে যুঝিয়া শত্রুর হাতে নিহত হইল। এই সময় হাতীর শুঁড়ে তল্‌ওয়ারের দুইটি ঘা পড়িলে হাতী মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায়; শত্রুরা তাহার পশ্চাদ্ভাগে তৎক্ষণাৎ দুই-তিনটি বর্শার আঘাত করে। মাহুত বেগতিক দেখিয়া তখন হাতী সহ নূরজহান্‌কে লইয়া পলাইতে উদ্যত হয়! অবশেষে অতিকষ্টে হাতীকে নদী পার করাইয়া নূরজহানের প্রাণ রক্ষা করা হয় বটে, কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিল।*

মহাবতের সঙ্গে নূরজহানের যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য—সম্রাটের উদ্ধারসাধন। যুদ্ধে যখন তাহা হইল না, হইবার সম্ভাবনাও নাই, তখন যুদ্ধের দিক্ দিয়া সম্রাটের উদ্ধারসাধনের ইচ্ছা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি দীনভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া

---

* 'ইক্‌বাল্-নামা'-রচয়িতা নবাব মুতমদ্ খাঁ (অপর নাম নবাব মুহম্মদ ও মুহম্মদ শরীফ) এই যুদ্ধে বেগমের তরফে ছিলেন। তাঁহারই রচনার সাহায্যে এই অধ্যায়টি লিখিত।

স্বামীর বন্দিশালায় উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার দুঃখের সমান অংশ গ্রহণ করিয়া পত্নীত্বের গৌরব বাড়াইলেন।*

এই জয়লাভের পর মহাবৎ বন্দী বাদশাহ্-পরিবারকে লইয়া কাবুলে যান; তথায় কয়েক মাস কাটাইবার পর লাহোর অভিমুখে যাত্রা করেন।

মহাবৎ যেমন বীর, তেমনি নির্ব্বোধ। দিল্লীশ্বর তাঁহার নজর-বন্দী, তাহার উপর দিল্লীশ্বরীও পরাজিত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন। গর্ব্বের চরম সীমায় উঠিয়া তিনি 'ধরাকে সরা' জ্ঞান করিতে লাগিলেন। আমীর-উমারাদের অনেকের সহিত আর তাঁহার সদ্ব্যবহার নাই, তাহাদিগকে তিনি তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখেন। সুচতুরা দিল্লীশ্বরী, সম্রাট্‌কে মুক্ত করিবার একটা সূত্র খুঁজিয়া পাইলেন। তিনি সুবিধা পাইলেই মহাবতের বিরুদ্ধে উমারাগণকে উত্তেজিত করেন, তাঁহারাও মহাবতের উপর তুষ্ট নহেন,—অল্পেই উত্তেজিত হইয়া উঠেন। ওদিকে সম্রাট্ নূরজহানেরই পরামর্শ-মত মহাবতের সহিত মধুর হইতে মধুরতর ব্যবহার করিতেছেন, এমন

---

* কখন্ নূরজহান্ সম্রাটের সহিত পুনর্ম্মিলিত হন, 'ইক্‌বাল্-নামা'য় তাহার উল্লেখ নাই। আসফ্ খাঁ আটক-দুর্গে পলাইতে বাধ্য হন। কিন্তু এই যুদ্ধের পর মহাবৎ আটক-দুর্গ অবরোধ করিয়া আসফ্ খাঁকে বন্দী করেন। (*Iqbalnama*, p. 267). "তৎপরে নূরমহলকে বাদশাহ্‌র অভিপ্রায়মত তাঁহার শোক-রজনীর সঙ্গিনী করিয়া, বাদশাহ্‌র রক্ষার জন্য অর্দ্ধেক সৈন্য রাখিয়া, বাকী অর্দ্ধেক লইয়া মহাবৎ স্বয়ং আসফের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।" (Khafi Khan, i. 372).

কি, নূরজহান্ যে লোকটি ভাল নহে, তাঁহার কুপরামর্শেই যে মহাবতের সহিত তাঁহার একটা সঙ্ঘর্ষের কারণ হইয়াছিল, ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া তাঁহার মন ভিজাইতেছেন। মহাবতের মনও গলিয়া গিয়াছে; ভাবিতেছেন, সম্রাট্ তাঁহার একান্ত আপনার হইয়াছেন, না-হইলে কি আর বেগমের নিন্দা করিতে পারেন? আনন্দে আত্মহারা হইয়া মহাবৎ সম্রাটের সম্বন্ধে আর এতটুকু সতর্ক রহিলেন না। তাঁহার উপর নজর রাখিবার জন্য যে-সব প্রহরী নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে সরাইয়া দেওয়া হইল।

পথ অনেকটা খোলসা হইলে, নূরজহান্ গোপনে ও প্রকাশ্যে কার্য্য করিতে লাগিলেন, আর স্বয়ং অর্থসাহায্যে অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। ঝড় উঠিবার পূর্ব্বলক্ষণ! মহাবৎ খাঁ ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; আর পারিলেও, এই আসন্ন সঙ্ঘর্ষের প্রতিবিধানের ক্ষমতা তাঁহার ছিল না; কারণ, কাবুল শহরে একটা দাঙ্গায় সাড়ে ছয়-শ রাজপুত হত হওয়ায় তাঁহার প্রধান সহায় রাজপুত-সৈন্যগণের সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছিল যে, সেই অল্প লোকের সাহায্যে তাঁহার কিছুই করিবার উপায় ছিল না। এদিকে বেগমের অনুচর, খোজা হুশিয়ার খাঁ দুই হাজার ঘোড়-সওয়ার লইয়া আসিতেছিল। সে লাহোরে থাকিতেই বেগমের পত্র পায়। জহাঙ্গীর তখন কাবুল হইতে ফিরিতেছেন। তিনি যখন রোটাস্-দুর্গ হইতে এক দিনের পথ উত্তরে, তখন এই নূতন বাহিনী তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল। তখন সম্রাট্ নিজ সৈন্যগণকে মহলার ছলে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইবার আদেশ দিলেন। সৈন্যগণ যখন

সজ্জিত হইয়া সমবেত হইল, তখন সম্রাট্ মহাবৎ খাঁকে জানাইলেন যে, বেগমের নবগঠিত সেনাদলের মহড়া—কুচ-কাওয়াজমাত্র—হইবে; মহাবৎ যেন আজ তাঁহার রাজপুত-সৈন্যদের সেখানে সমবেত না করেন। করিলে বেগমের সৈন্যদের সহিত একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়া বিচিত্র নয়। সম্রাটের উপদেশমত মহাবৎ দূরে রহিলেন।

নূরজহান্ সত্য সত্যই সূচ হইয়া ঢুকিয়া ফলা হইয়া বাহির হইবার আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহার দলবলের সহিত আঁটিয়া উঠা দায়। পর-দিন প্রাতঃকালে হুশিয়ার খাঁ-প্রেরিত বেগমের নূতন সৈন্যদল সম্রাটের সৈন্যদের সহিত মিলিয়া, রাজশিবিরের সম্মুখভাগে শ্রেণি-বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। উদ্দেশ্য—সম্রাট্‌কে নিরাপদ্ করা। মহাবৎ সংবাদ পাইয়া ব্যাপারটা ভালরকমই বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তাঁহার আর বাধা দিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি রোটাসের নিকট ঝিলম নদী পার হইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। *

যোগ্য পুত্র শাহ্‌জহান্‌ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না; মহাবতের হাতে পিতার লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া বিদ্রোহীকে সমুচিত শাস্তি দিবারজন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার লোকজনের একান্ত অভাব; তৎসত্ত্বেও তিনি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নাসিক হইতে যাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যে অনুচরগণের অনেকেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করে। যে চার-পাঁচ শত সৈন্য অবশিষ্ট থাকে, তাহা লইয়া সম্রাটের নিকট

* যে নদীর তীরে মহাবৎ একদিন জহাঙ্গীরকে বন্দী করেন, ঠিক সেই নদীরই তীরে আবার তাঁহার নিজের এই পরাজয় ঘটে। (*Iqbalnama*, p. 277).

উপস্থিত হওয়া দুরূহ। শাহ্‌জহান্ স্থির করিলেন, সিন্ধুপ্রদেশে গিয়া, লোকজন-সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু সেখানে শহ্‌-রিয়ারের প্রতিনিধি শরীফ-উল্-মুল্ক তাঁহাকে বাধা দেন। এই সময়ে শাহ্‌জহান্ নূরজহানের নিকট হইতে এই মর্ম্মে একখানি পত্র পান যে, শাহ্‌জহানের আগমন-বার্ত্তায় মহাবৎ ভীত—তাহার সৈন্য-সামন্ত ছত্রভঙ্গ, অতএব কুমার এখন দাক্ষিণাত্যে ফিরিতে পারেন। বেগমের কথামত শাহ্‌জহান্ গুজরাটের পথে দাক্ষিণাত্যে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন।

জাহাঙ্গীরের সমাধি-মন্দির, লাহোর

৫
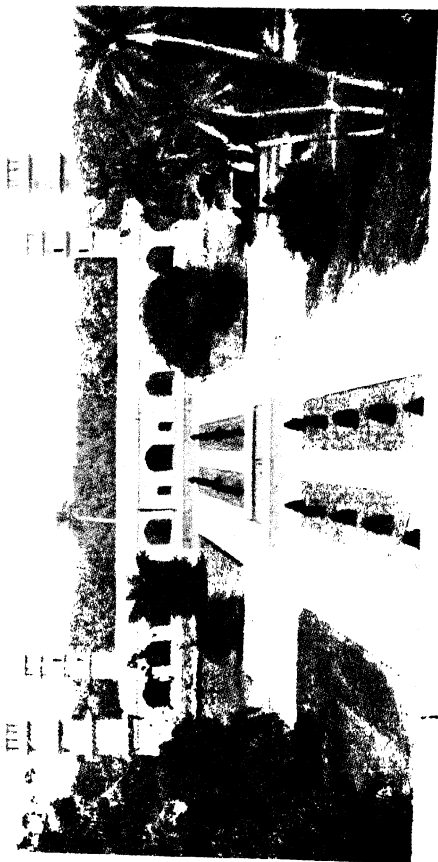
জহাঙ্গীরের মৃত্যু ; স্বামি-বিয়োগে

জহাঙ্গীর বাদশাহ্ মহাবতের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। বয়স অধিক হইয়াছিল, তাহার উপর উদ্বেগ, অশান্তি, আবার উপর্য্যুপরি দুইটি পুত্রশোক,—খসরু ও পরবেজের মৃত্যু—তাঁহাকে একেবারে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল। তিনি আর সামলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। লাহোরে ফিরিবার মুখে ৫৮ বৎসর (সৌর) বয়সে, কাশ্মীরের রাজাওর প্রদেশের নিকট তাঁহার মৃত্যু হইল (২৮ অক্টোবর ১৬২৭)।

জামাতা শাহ্‌জহান্ যাহাতে সিংহাসন পান, আসফ খাঁ তাহার জন্য তলে তলে চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন সুযোগ বুঝিয়া অবিলম্বে শাহ্‌জহানের নিকট সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ পাঠাইলেন।

এদিকে জামাতার সিংহাসন-প্রাপ্তির পথে পাছে কোন কণ্টক উপস্থিত হয়, এজন্য নূরজহান্‌ও সতর্ক ছিলেন। তাই তাঁহারই পরামর্শে কুমার খসরুর পুত্র বুলাকীকে (দওয়ার বখশ্) শহ্রিয়ার নিজের তত্ত্বাবধানে রাখিতেন। শহ্রিয়ার তখন লাহোরে। বুলাকীর উপর নজর রাখিবার ভার ছিল—ইরাদৎ খাঁর উপরে। সুচতুর আসফ খাঁ ইরাদৎ খাঁকে ফোঁসলাইয়া হাত করিলেন, আর

বালক বুলাকীকে দেখাইলেন সিংহাসনের লোভ। বালক খুশী হইয়া যাই তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, অমনি তিনি তাহাকে ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া রাজধানীর দিকে ছুটিলেন। আমীর-উমারারাও আসফের অভিপ্রায়, তথা হাওয়ার গতি বুঝিয়া ঐ দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন। আসফ খাঁ বেশ জানিতেন, তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রধান অন্তরায়—ভগিনী নূরজহান্। তাই যাহাতে কাহারও সহিত তাঁহার পত্রব্যবহার না হয়, সে জন্য তিনি অত্যন্ত হুশিয়ার। নূরজহান্ বেগতিক দেখিয়া ভ্রাতাকে বারম্বার ডাকিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, আসফও নানারূপ ওজর-আপত্তি দেখাইয়া ভগিনীর সম্মুখীন হইলেন না ;—তাঁহাকে এক দিনের পথ পশ্চাতে রাখিয়া চলিতে লাগিলেন।

শহ্রিয়ার সম্রাটের মৃত্যুর পূর্ব্বে লাহোরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনিবামাত্র তিনি পত্নীর পরামর্শে লাহোরের রাজকীয় ধনসম্পত্তি অধিকার করিলেন ও সিংহাসন-লাভের আশায় লোকজন-সংগ্রহে অকাতরে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। 'নূরজহানের প্ররোচনায় শহ্রিয়ার লাহোরে নিজেকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন।' (Ain, i. 311.) সত্বর সৈন্যাদি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য নূরজহান্ জামাতাকে পত্র লেখেন।'

এদিকে আসফ খাঁ সদলবলে যখন লাহোরের তিন ক্রোশ দূরে, তখন শহ্রিয়ারের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ হইল। এই যুদ্ধে শহ্রিয়ারের পরাজয় ঘটে।

শাহ্‌জহান্ আসফের নিকট হইতে সকল সংবাদই পাইতে-ছিলেন। তিনি সত্বর আসিয়া শূন্য সিংহাসন জুড়িয়া বসিলেন। নূরজহানের বহু দিনের আশা-ভরসা নিশার স্বপনে পরিণত হইল। স্বামী পরলোকগত, শহ্‌রিয়ার পরাজিত, বাদ্‌শাহী-তক্ত শাহ্‌জহান্ কর্তৃক অধিকৃত,—নূরজহান্ ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

জহাঙ্গীরের ঔরসে নূরজহানের কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই। শাহ্‌জহান্ সিংহাসনে বসিয়া নূরজহানের জন্য বার্ষিক দুইলক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন। এই বৃত্তি লইয়াই তাঁহাকে আমরণ সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বক্ষমতা ও প্রতিপত্তিলাভের জন্য আর কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই।

খাফি খাঁ বলেন,—'জহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর নূরজহান্ হিন্দু-বিধবার ন্যায় সাদা কাপড় পরিতেন; স্বেচ্ছায় কোন উৎসব-আনন্দে (শাদি) যোগ দিতেন না; কেবল স্বামীর স্মৃতি হৃদয়ে ধরিয়া, মনের দুঃখে নির্জ্জনে দিনাতিপাত করিতেন।' আনুমানিক ৭০ বৎসর বয়সে লাহোরে দিল্লীশ্বরীর শেষ অনাড়ম্বর জীবনের অবসান হয় (৮ ডিসেম্বর, ১৬৪৫)। স্বামীর সমাধি-মন্দির হইতে কিছু দূরে শাহ্‌দারায় তিনি যে বাহুল্যবর্জ্জিত সাধারণ রকমের একটি সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, মৃত্যুর পর সেইখানেই সমাহিতা হন।* সমাধি-ফলকে এই কবিতাটি লিখিত আছে,—

* ইহা নির্ম্মাণ করিতে সময় লাগে ৪ বৎসর, আর ব্যয় হয় তিন লক্ষ টাকা (Abdul Hamid's *Padishah-nama*, Pers. Text, ii. 475.)

বর্‌ মজারে মা গরীবাঁ না চিরাগে না গুলে

না পরে পরওয়ানা সূজদ্‌ না সদায়ে বুলবুলে।

ইহার ভাবানুবাদ এইরূপ :—

দীনের গোরে দীপ দিও না

সাজায়ো না ফলফুলে

পোকায় যেন পোড়ায় না পাখ্‌

গায় না গাথা বুলবুলে।

ঐতিহাসিকেরা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, জহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ ভাগকে নূরজহানের রাজত্বকাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সম্রাট্ নিজেই বলিতেন, 'নূরজহান্‌কে আমি তীক্ষ্ণবুদ্ধি-শালিনী ও সর্ব্বাংশে উপযুক্ত জানিয়াই রাজ্য-শাসনের সমস্ত ভার দিয়াছি। আমি শুধু একটু মদ ও কিছু মাংস পাইলেই খুশী।' যাঁহারা বলেন, নূরজহান্ সম্রাজ্ঞী হইয়া শুধু সৌন্দর্য্যের বলেই জহাঙ্গীরকে 'ভেড়া বানাইয়া' রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা ভুল করেন। রূপের মোহ একদিন না একদিন কাটিয়া যায়—চিরস্থায়ী হয় না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চরিত্র-বলই নূরজহানের আধিপত্যের প্রধান কারণ। সেই জন্য বেভ্‌রিজ লিখিয়াছেন,—'আকবর যদি মিহ্‌র-উন্নিসার সহিত সলীমের বিবাহ দিয়া যাইতেন ত বড় ভাল হইত।' (*Ency. of Islam*—'Djahangir'). তাহা হইলে জহাঙ্গীরকে মদের নেশায় পাইয়া বসিত না। জীবন সুনিয়ন্ত্রিত এবং রাজ্য সুশাসিত রাখিয়া তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হইতে পারিতেন।

জহাঙ্গীরের নামোল্লেখ হইত—একমাত্র সম্রাটের কল্যাণ-কামনায় সাধারণ প্রার্থনা—'খুৎবায়'। এ ছাড়া রাজ্যের যাবতীয় কার্য্যেই নূরজহানের নাম বিজড়িত—তিনিই সব দেখিতেন

শুনিতেন। এক কথায় তখন সম্রাট্, সিংহাসন, সাম্রাজ্য—সবই নূরজহানের করতলগত, জহাঙ্গীর নামে মাত্র সম্রাট্। সম্রাটের পরিবর্ত্তে নূরজহান্ নিজে প্রতি দিন প্রাতঃকালে পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া 'ঝরোকা'তে (দর্শনের জানালা) বসিতেন। তাঁহাকে না দেখিয়াই প্রজাবৃন্দ রাজদর্শনের সৌভাগ্যলাভ হইল বলিয়া মনে করিত। এই সময়ে সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীরা রাজকার্য্য-সম্বন্ধে তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করিতেন।

সে সময়কার অনেক ফর্ম্মানে রাজমোহরের পাশে নূরজহানের নামের ছাপ থাকিত। এমন কি, রাজমুদ্রাতেও তাঁহার নাম এই ভাবে স্থান পাইত :—

বা-হুকুমে-শাহ্ জহাঙ্গীর ইয়াফ্‌ৎ সদ্ জেউয়র্
বনামে-নূরজহান্ পাদিশাহ্ বেগম্ জর্।

অর্থাৎ,—সম্রাট্ জহাঙ্গীরের হুকুমে সম্রাজ্ঞী নূরজহানের নাম সংযুক্ত হওয়ায়, মুদ্রার গৌরব শতগুণ বৃদ্ধি পাইল।

স্ত্রীলোককে জমি দান করিতে হইলে দান-পত্রে নূরজহানের মোহর না থাকিলে চলিত না। মেয়েদের দানখয়রাৎ করিবার জন্য একটা বিভাগ ছিল। নূরজহানের ধাত্রী দাই দিলারাম্ তাঁহারই অনুগ্রহে ঐ বিভাগের কর্ত্রীপদ—'সদর-ই-অনস্' পাইয়াছিলেন।

প্রজারা যে নূরজহান্‌কে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিত, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি দীনের জননী ছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহ-ভিখারী হইলে কাহাকেও রিক্তহস্তে ফিরিতে হইত না। নূরজহান্

বহু অনাথ বালিকাকে সাহায্য করিতেন, এমন কি, নিজব্যয়ে অন্ততঃ পাঁচ শত বালিকার বিবাহ দিয়াছিলেন।

রাজ্যশাসনে নূরজহানের অসীম কর্ত্তৃত্ব। লোকে কার্য্যোদ্ধারের জন্য অনেক সময় তাঁহারই শরণাপন্ন হইত। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজদূত সার্ টমাস রো বাণিজ্যের সুবিধার্থ সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। জহাঙ্গীর তখন আজমীরে। নূরজহানের রাজ্যশাসন-ক্ষমতার উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস— এমন কি, বিশেষ বিশেষ রাজকার্য্যে বেগমের পরামর্শ না হইলে চলিত না। রো এ-সংবাদ জানিতেন। ব্রিটিশ্-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তাই তিনি বেগমকে একখানি সুন্দর বিলাতী গাড়ী ও অন্যান্য দ্রব্য উপঢৌকন দিয়া খুশী করিয়াছিলেন। রো যে-সমস্ত দ্রব্য ব্যবসার জন্য আনিতেন, নূরজহান্ তাহার নিরাপত্তার ভার লইয়াছিলেন।*

নূরজহানের অনেক নিজস্ব জমিদারী ছিল। ইহার অধিকাংশের এলাকা, আজমীরের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে, রামসর ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে। দুই লক্ষ টাকা আয়ের বোদা (টোডা?) পরগণাও তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল (*Tuzuk*, i. 380).

এই বিদুষী ললনা নিজেও যেমন সুন্দরী ছিলেন, তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ, উদ্ভাবনীশক্তি এবং ললিত শিল্পকলাজ্ঞানও তেমনই

---

* *Embassy of Sir Thomas Roe*, ed. by William Foster, ii, 436.

অনন্যসাধারণ ছিল। 'অতর্-ই জহাঙ্গীরী' নামক গোলাপসার না কি তাঁহারই আবিষ্কার (*Ain*, i. 510)। পেশওয়াজের দুদামী, ওড়নার পাঁচতোলিয়া, বাদ্লা, কিনারী, নূরমহলী এবং ফরস্-ই-চন্দনী (চন্দন-কাঠের রঙের কার্পেট) তাঁহারই কারু-কল্পনার ফল।*

নূরজহানের সৌন্দর্য্যানুভূতি ও কলানুরাগের পরিচয় তাঁহার নির্ম্মিত উদ্যানে, অত্যুচ্চ প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যে আরও স্ফুটতর। জহাঙ্গীর লিখিয়াছেন,—'তৎকালে এমন নগর বা শহর ছিল না, যেখানে নূরজহানের কীর্ত্তিরাজি সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করে নাই।' মহিষী নূরজহান্ নয়নাভিরাম 'নূর-সরাই'† প্রস্তুত করাইয়া মুসাফীরদিগের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। কাশ্মীরে ঝিলম নদীতীরে অবস্থিত ছায়াশীতল চেনার-বৃক্ষসমন্বিত 'নূর-আফশান্' উদ্যান তাঁহারই ব্যয়ে নির্ম্মিত।‡

নূরজহানের সৌখিনতার উল্লেখ করিতে গিয়া 'মাসির-উল্-উমারা' লিখিয়াছেন, প্রতি বার স্নান করিতে তাঁহার তিন হাজার টাকা ব্যয় হইত।

অভিনব আদর্শের বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার ও নারী-পরিচ্ছদ প্রচলন

---

* দুদামী—ওজনে দুই দাম (তামার ৪০ দামের মূল্য এক টাকা); পাঁচতোলিয়া—ওজনে পাঁচ তোলা। পেশ্‌ওয়াজ = gown; বাদ্লা = brocade; কিনারী = lace; নিচোল = skirt; আঙ্গিয়া = bodice; নূরমহলী—এই প্যাটার্ণের কাপড়ে প্রস্তুত বর-কনের কিংখাবের সাজপোষাক পঁচিশ টাকায় পাওয়া যাইত।

† Cunningham : *Arch. Reports*, XIV. 62.

‡ Abdul Hamid : *Padishah-nama* I. B. p. 27.

করিয়া নূরজহান্ তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আপাদলম্বিত নিচোল ব্যবহার তাঁহারই প্রবর্ত্তন। লক্ষ্ণৌ শহরের সম্ভ্রান্ত ললনাকুল তখনকার দিনে তাঁহারই অনুকরণে নিচোল ব্যবহার করিতেন। নূতন ধরণের এক প্রকার আঙ্গিয়াও তাঁহারই নামে সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছিল। ওড়নার ব্যবহারও নূরজহান্ হইতে।*

এই আশ্চর্য্য গুণময়ী ললনার রন্ধন-নৈপুণ্যের কথা তখন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সম্রাটের তৃপ্তিসাধনের জন্য তিনি নিত্য নব মুখরোচক আহার্য্য-দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। বাস্তবিক তাঁহার ন্যায় পাচিকা সে সময় বিরল ছিল। দস্তরখান্ (ভোজের গালিচা) সজ্জিত করিবার অভিনব প্রণালী ও উপায়-উদ্ভাবন, এবং ভোজ্য দ্রব্যগুলি কুসুমাকারে বিন্যস্ত করিয়া এই সুন্দরী রমণী সৌন্দর্য্যানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেন।

সঙ্গীতের প্রতি নূরজহানের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল ; এই ললিত-কলার সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুধাস্রাবী গীতি শ্রোতাকে শোকদুঃখময় জগতের কথা ভুলাইয়া দিত।

কেবল নারীসুলভ কোমল কারুকার্য্যে নয়, এই লোকললামভূতা ললনার মৃণাল ভুজদ্বয় সময় সময় যে পৌরুষের পরিচয় প্রদান করিত, তাহাতে চমৎকৃত হইতে হয়। মৃগয়া-ব্যাপারে তাঁহার

* "Writing a century later, Khafi Khan [i. 269] remarks that the fashions introduced by Nur Jahan still governed society and that the old ones survived only among the Afghans in backward towns."—Beni Prasad: *Jahangir*, p. 185.

অদ্ভুত পটুত্ব মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কে জহাঙ্গীর একদিন নূরজহান্‌কে লইয়া শিকারে বাহির হন। ভৃত্যেরা চারিটি বাঘকে ঘেরাও করিলে, নূরজহান্ স্বহস্তে তাহাদিগকে নিহত করিবার জন্য সম্রাটের অনুমতি গ্রহণ করেন, তার পর হস্তিপৃষ্ঠে হাওদার ভিতর হইতে অব্যর্থ লক্ষ্যে দুইটি ব্যাঘ্রকে দুইটি গুলিতে, আর বাকী দুইটিকে, দুইটি করিয়া চারিটি গুলিতে বধ করেন। 'তুজুকে' সম্রাট্ স্পষ্টই লিখিয়াছেন, এমন অব্যর্থ লক্ষ্যে আর কখনও তিনি ব্যাঘ্র-শিকার দেখেন নাই। জহাঙ্গীর খুশী হইয়া নূরজহান্‌কে এক লক্ষ টাকা মূল্যের এক জোড়া হীরার পুঁছি (bracelet) ও হাজার আশ্‌রফি উপহার দেন। এই ব্যাঘ্র-শিকার উপলক্ষ্যে একজন সভাসদ্ নিম্নের কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন,—

নূরজহান্ গরচে বাসুরৎ জন্ অস্ত্।
দর্ সফ্-ই মর্দান্ জন্-ই-শের আফ্‌কন্ অস্ত্।

অর্থাৎ,—'নূরজহান্ আকৃতিতে স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু বীরপুরুষের দলে তিনি ব্যাঘ্রহন্ত্রী নারী।' দ্বিতীয়ার্থে শের আফ্‌কনের স্ত্রী।

আর্বী ও ফার্সী সাহিত্যে এই বিদুষী মহিলা বিশেষরূপে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 'মখ্‌ফী' ছদ্ম নাম লইয়া পারস্য ভাষায় তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। যে-সমস্ত গুণের জন্য নূরজহান্ সম্রাটের হৃদয়ে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, উপস্থিত-মত কবিতা রচনা তাহার অন্যতম।* খাফি খাঁর গ্রন্থে নূরজহানের রচিত কবিতার নিদর্শন আছে।

* **Beale :** Or. *Bio. Dic.* 304.

৭

চরিত্র

কাহারও চরিত্র সমালোচনা করা সকল সময়ে বিশেষ প্রীতিকর ব্যাপার নহে; বিশেষতঃ সেই 'কেহ' যদি রমণী হন, তাহা হইলে সে কাজ আরও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। তবে একটা কথা আছে; নূরজহান্ এক সময়ে বলিতে গেলে মোগল-সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন; তাঁহারই হস্তে সাম্রাজ্যের শুভাশুভের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল। এ অবস্থায় তাঁহাকে সাধারণ রমণী বা বাদশাহের বিলাস-সঙ্গিনী বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়; সুতরাং তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা ইতিহাসের বিষয়ীভূত।

নূরজহান্ আমীর মাতাপিতার আদরের কন্যা। তাঁহার পিতা স্বদেশের এক জন প্রতিষ্ঠাপন্ন লোক; পরে তাঁহার অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটে। এ অবস্থায় অন্য কেহ হইলে দেশ ত্যাগ করিতেন না, সুদিনের প্রতীক্ষায় ঘরে বসিয়া থাকিতেন, অথবা দেশের মধ্যেই ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু নূরজহানের পিতা সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সৌভাগ্যের অন্বেষণে সুদূর ভারতে গিয়া স্বীয় প্রতিভা ও কার্য্যকুশলতার বলে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এমন দৃঢ়চিত্ত, উচ্চাভিলাষী, সুচতুর ও কর্ম্মকুশল পিতার ঔরসে যাঁহার জন্ম, তাঁহার পক্ষে সামান্য দাসীর ন্যায় বিলাস-সঙ্গিনীর ন্যায় জীবন যাপন করা একেবারেই অসম্ভব।

তাহার পর তাঁহার এক অমোঘ অস্ত্র ছিল—অসামান্য রূপ। এই রূপের প্রভাবেই তিনি সম্রাট্ জহাঙ্গীরকে খেলার পুতুল করিতে পারিয়াছিলেন; এই রূপের আকর্ষণেই বিশাল মোগল-সাম্রাজ্য তাঁহার করতলগত হয়। তাহার পর বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্মকুশলতা এবং সর্ব্বোপরি রাজনীতিক কৌশল তাঁহার অধিকার দৃঢ়তর করিয়াছিল।

একটু গোড়া হইতে কথাটার আলোচনা করা যাক। মাতার সহিত কন্যা বাদশাহ্‌র অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতেন। মিহ্‌র তখন উদ্ভিন্ন-যৌবনা; তাঁহার অতুলনীয় অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যের সাগরে তখন প্রথম বান ডাকিতেছিল। সেই সময় যুবরাজ সলীমের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ। তাঁহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যুবরাজ তাঁহার অনুরাগী হইলেন। মিহ্‌রও যে অদূর ভবিষ্যতে নিজেকে মোগল-সিংহাসনে শাহ্‌জাদার পাশে বসাইবার আশা মনে মনে পোষণ করেন নাই, তাহা বলা যায় না। কোন্ রমণী এমন স্বামী, এত ধনসম্পদ্, এমন বিলাসবিভ্রম, এমন রত্ন-সিংহাসনের প্রার্থিনী না হন?

কিন্তু প্রণয়ি-যুগলের এই মিলনে বিঘ্ন উপস্থিত হইল। বাদশাহ্ আক্‌বর পুত্রের এই প্রণয়-ব্যাপারের বিরোধী হইলেন। খুব সম্ভব এই বিরোধের কারণ—রাজনীতি বা সমাজনীতি। তিনি মিহ্‌রকে শের আফ্‌কনের সহিত বিবাহ দিয়া সুদূর বর্দ্ধমানে নির্ব্বাসিত করিলেন। উভয়ের মধ্যে সাময়িক একটা ব্যবধানের সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু সলীমের হৃদয়-পটে যে-ছবি অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা মুছিয়া গেল না, বরং তাহা আরও উজ্জ্বল—আরও স্থায়ী হইয়া শোভা

পাইতে লাগিল; তিনি ভবিষ্যতের দিকে আশা-প্রদীপ্ত নয়নে চাহিয়া রহিলেন। মিহ্‌র তখন বর্দ্ধমানেই জীবনের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। একদিন যে আশার কুহকে তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন—যুবরাজ, যুবরাজের রাজ্য ঐশ্বর্য্য, সব ভুলিয়া তিনি বীর স্বামী শের আফ্‌কনের প্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন।

তাহার পর যাহা হইল, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শের আফ্‌কনের শোচনীয় হত্যার পর মিহ্‌র দিল্লীতে উপস্থিত হইলে, বাদশাহ্ জহাঙ্গীর তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি সম্রাটের নিকট স্বামি-হত্যার বিচার প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে বিমাতার মহলে পাঠাইয়া দিলেন। মিহ্‌র সেখানে অনেক দিন উপেক্ষিত অবস্থায় কালযাপন করেন। তাহার পর, একদিন নৌরোজার রূপের হাটে তাঁহার সহিত দেখা। মুগ্ধ আত্মহারা সম্রাট্ আবার তাঁহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। এবার আর মিহ্‌র সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না।

মিহ্‌র এখন রাজ্যেশ্বরী—জহাঙ্গীর বাদশাহ্‌র হৃদয়-রাজ্যের এবং মোগল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী। অতি হীন অবস্থা হইতে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের অত্যুচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইবার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নহে। কিন্তু মরু-বক্ষের নৈরাশ্যময় দৈন্য হইতে ভারত-সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব-লাভের সৌভাগ্য—এ যে স্বপ্নেরও অগোচর। মিহ্‌র মরুভূমির সন্তান—মরুর মতই চিরপিপাসাতুর; তাঁহার

উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না। এত দিন পরে সুযোগ উপস্থিত হইল ;—সহায় তাঁহার অলোকসামান্য রূপ ; আর কুশাগ্র বুদ্ধি। প্রথমে তিনি রূপের মোহে জহাঙ্গীরকে অভিভূত করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, সম্রাট্ একেবারে মশগুল্, তখন তাঁহার হাত হইতে ধীরে ধীরে রাজ্যভার লইতে লাগিলেন। আমীর-উমারা, মন্ত্রী-সভাসদ্ সকলেই এই মহিলার বুদ্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন।

মানুষের যাহা যাহা প্রার্থনীয়, নূরজহান্ সে সমস্তেরই অধিকারিণী হইলেন। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায় না, সেই ধনই পাইলেন না। তাঁহার যশ, মান সম্ভ্রম, অতুল ক্ষমতা সকলই হইল—হইল না শুধু একটি পুত্রসন্তান—রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। এত ক্ষমতা, এত প্রভুত্ব কত দিন থাকিবে? জহাঙ্গীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে সব লোপ পাইবে! ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া নূরজহান্ দেখিলেন, তাঁহার থাকিবার মধ্যে আছে এক কন্যা লড্‌লি—পূর্ব্বস্বামী শের আফ্‌কনের ঔরসজাত কন্যা,—জহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শহ্‌রিয়ারের পরিণীতা পত্নী। শহ্‌রিয়ার সম্রাট্-পুত্র হইলেও সম্রাটের উপযুক্ত গুণগ্রাম কিছুই তাহার ছিল না। কূটবুদ্ধি নূরজহানের দৃষ্টি জামাতার উপর নিপতিত হইল ; তাহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিতে পারিলেও ভবিষ্যতে তাঁহার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে।

কিন্তু তাহার এক প্রধান বিঘ্ন—শাহ্‌জহান্। শাহ্‌জহান্ সর্ব্বাংশে সম্রাট্ হইবার উপযুক্ত, পিতার বিশেষ প্রিয়পাত্র, বীর-

নূরজহানের সমাধি-মন্দির, লাহোর
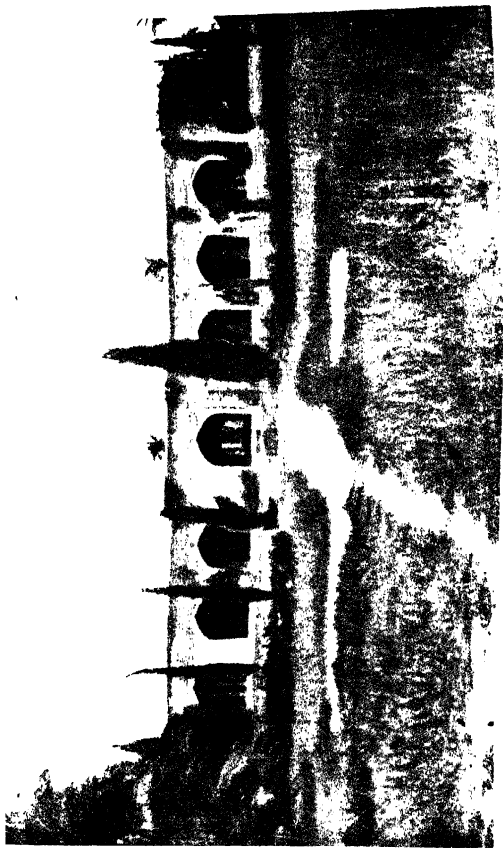
পুরুষ, রাজ্যশাসনক্ষম, দেশের সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ, অনুগত। এই শাহ্‌জহানের উপর সম্রাটের বিরাগ উৎপাদন করিতে না পারিলে নূরজহানের অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না, তাঁহার জামাতার রাজ্য-প্রাপ্তি ঘটে না। কার্য্য বড় সহজ নহে; কিন্তু পাত্রীও সহজ নহে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য নূরজহান্ কূটবুদ্ধির পরিচালনা করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না,—পিতাপুত্রে অসদ্ভাব জন্মাইয়া দিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সর্ব্বপ্রযত্নে নূরজহান্ তাহা করিতে অগ্রসর হইলেন। সে-সমস্ত কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার পরিণাম কি হইল, তাহাও সকলে জানেন। নূরজহান্-চরিত্রের এই অংশটাই কুটিলতার কলঙ্কে মলিন—এ কলঙ্ক কিছুতেই মুছিবার নহে।

স্বামীর মৃত্যুর এবং শাহ্‌জহানের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গেই নূরজহানের সমস্ত আশা-ভরসা লুপ্ত হইল। তিনি দিবা-চক্ষে দেখিতে পাইলেন, শাহ্‌জহানের সহিত কিছুতেই তিনি পারিয়া উঠিবেন না। এদিকে তাঁহার জামাতা শহ্‌রিয়ারও আর ইহজগতে নাই। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল, তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, ধন, সম্পদ্, ক্ষমতা কিছুই চিরস্থায়ী নহে—সুসময় অনেকের ভাগ্যেই চিরদিন থাকে না। তাই তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর যে অষ্টাদশ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য অণুমাত্রও চেষ্টা করেন নাই। বলিতে গেলে, সম্রাজ্ঞী নূরজহান্ প্রিয়তম পতি জহাঙ্গীরের সহিতই সমাহিতা হইয়াছিলেন; তার পর যিনি বাঁচিয়া ছিলেন, তিনি সম্রাজ্ঞী নূরজহান্ নহেন—তিনি

সম্রাট্ জহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী, সম্রাটের বিয়োগবিধুরা বিধবা-পত্নী !

এক এক করিয়া সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর কালসাগরে লীন হইল। কত জনের উত্থান পতন হইল। জহাঙ্গীর বাদশাহ্‌র মহিষী এই সুদীর্ঘ কাল লাহোরের এক নিভৃত নিকেতনে পলে পলে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। এই কয় বৎসর তাঁহার কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, খাফি খাঁ তাহা বলিয়াছেন। নূরজহানের শেষ-জীবনের কথা মনে হইলে হৃদয় বেদনায় ভরিয়া উঠে। মনে হয়, এই কি সেই নূরজহান্—যিনি সম্মান, ক্ষমতা ও প্রভুত্বলাভের জন্য অন্যায় ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন,—এই কি সেই নূরজহান্, যিনি ন্যায়ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য কত কাণ্ড করিয়াছিলেন ! মধ্যজীবনে সম্রাজ্ঞী নূরজহান্ যাহা করিয়াছিলেন, শেষজীবনে পতিবিয়োগবিধুরা নূরজহান্ লাহোরের নির্জ্জন আবাসে অহোরাত্র অশ্রুপাত করিয়া, সকল সুখে, সকল ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া, ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় জীবন যাপন করিয়া সে অপরাধের, সে পাপের কালিমা মুছিয়া ফেলিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কঠোর চরিত্র-নীতিক তাঁহাকে মার্জ্জনা না করিতে পারেন, তাঁহার অপক্ষপাত লেখনী সম্রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিতে পারে, কিন্তু দিল্লীশ্বরীর শেষজীবনের কথা স্মরণ করিয়া কি কেহ তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিবেন না ? মোগল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী—সম্রাট্ জহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষীর পক্ষে কি একটি দীর্ঘনিশ্বাসও দুর্লভ হইবে ?

প্রমাণ-পঞ্জী

(১) *Muntakkhab-ul-Lubab*, (Pers. text—Bib. Indica), Ist. vol.

গ্রন্থকার—মুহম্মদ হাশিম্ খাফি খাঁ, মোগল-সম্রাট্ বাবর হইতে আরম্ভ করিয়া মুহম্মদ শাহ্‌র চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্ক (১৭৩৩) পর্য্যন্ত ইতিহাস রচনা করেন। আওরংজীবের রাজত্বের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ঘটনাবলী প্রামাণিক গ্রন্থাদির সাহায্যে সঙ্কলিত; পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা-প্রসূত। নূরজহান্-প্রসঙ্গে খাফি খাঁ লিখিয়াছেন (পৃ, ২৬৩)—জহাঙ্গীর-নামা ইতিহাসের লেখক, একে সময় উপযুক্ত নহে, তাহার উপর দুই পক্ষের মান রাখিয়া চলা দরকার বলিয়া, নূরজহানের [প্রথম জীবনের] কাহিনী আগাগোড়া বর্ণনা করিতে অনেকগুলি ঘটনা চাপা দিয়াছেন ও বিষয়টি অন্যরূপ সাজাইয়াছেন। কিন্তু আমি অনুসন্ধানে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি, এবং সুজার ভৃত্য মুহম্মদ সাদিক্ তব্‌রেজী-লিখিত 'মিন্‌হজ্-উস্-সাদিকাইন্' গ্রন্থে যাহা পড়িয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।" ১৩১৮ সালের আশ্বিন-সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত শ্রীযদুনাথ সরকার-লিখিত "বাদ্‌শাহী গল্প (ফার্সী হইতে)" দ্রষ্টব্য।

(২) *Padishah-nama*, (Pers. text—Bib. Ind.) 2 vols.

গ্রন্থকার—আব্‌দুল্‌ হমীদ্‌ লাহোরী। আবুল-ফজলের 'আকবর-নামা'র আদর্শে রচিত শাহ্‌জহানের রাজত্বকালের প্রথম ২০ বৎসরের ইতিহাস।

(৩) *Iqbalnama-i-Jahangiri*, (Pers. text—Bib. Ind.)

গ্রন্থকার—জহাঙ্গীরের বখ্‌শী, নবাব মুতমদ্‌ খাঁ।

(৪) *Masir-ul-umara*, (Pers. text, Bib. Ind.) 3 vols.

মোগল-সাম্রাজ্যের আমীর-উমারাদের চরিতাভিধান। আনুমানিক ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে আরব্ধ হইয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহার রচনা সম্পূর্ণ হয়। নূরজহান্‌ সম্বন্ধে ইহাতে যেটুকু সংবাদ আছে, তাহা খাফি খাঁরই পুনরুক্তি মাত্র।

(৫) Rogers' trans. of *Tuzuk-i-Jahangiri*, or *Memoirs of Jahangir*, ed. by H. Beveridge, (O. T. Fund Series). 2 vols.

সার্‌ সৈয়দ্‌ অহমদ্‌-সম্পাদিত বিশুদ্ধ ফার্সী-পাঠ অবলম্বনে রজার্স এই আত্মকাহিনী ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। মূল্যবান্‌ টীকা-টিপ্পনী সহ বেভ্‌রিজ ১৯০৯ ও ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। Anderson ও Price উভয়ে অনুবাদ করিয়া দুইখানি *Memoirs of Jahangir* বাহির করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা অশুদ্ধ ফার্সী পুঁথি অবলম্বনে লিখিত, অনুবাদও নির্ভুল নহে।

(৬) *Ain-i-Akbari* by Abul Fazl Allami, trans. by H. Blochmann, Calcutta, 1873, Vol. I.

ইহার প্রথম খণ্ডের শেষে মনসব্‌দারগণের যে জীবন-চরিত আছে, তাহা প্রধানতঃ 'মাসির-উল্‌-উমারা,' 'তুজুক-ই-জহাঙ্গীরী,' 'তবকাৎ-ই-আকবরী,' 'বদায়ূনী' এবং 'আকবর-নামা'র সাহায্যে ব্লকমান্‌ কর্তৃক সঙ্কলিত। সযত্নে পাঠ করা উচিত।

(৭) Elliot & Dowson's *History of India as told by its own historians*. Vols. vi & vii.

এই অমূল্য গ্রন্থে বহু মূল্যবান্‌ ফার্সী পুঁথির সারাংশ ইংরেজীতে দেওয়া হইয়াছে।

(৮) *The Hawkins' Voyages*, ed. by Sir Clements Markham ; (Hakluyt Socy.) 1878.

জহাঙ্গীরের রাজত্বকালের প্রারম্ভে হকিন্স ভারতে আসেন। তিনি সম্রাটের সহিত একত্রে মদ খাইতেন। হকিন্স বাদশাহ্‌ ও বাদশাহী-দরবার সম্বন্ধে নিজের চোখে দেখিয়া যাহা-কিছু লিখিয়াছেন, তাহার মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু যেখানে তিনি ইতিহাস লিখিতে গিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহাকে বাজারগুজবের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

(৯) *Embassy of Sir Thomas Roe to the Court of the Great Mogul.* 1615-1619 *as narrated in his journal and correspondence*, ed. by Wm. Foster, (Hak : Socy.) 2 vols.

নূরজহানের বিষয়ে, এবং সে সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে, এই গ্রন্থ হইতে অনেক কথা জানা যায়। রো ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য নূরজহানের যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।

রো সাহেবের পুরোহিত Terryও এই দৌত্যকার্য্যের অপর এক বিবরণ *Voyages* নামে প্রকাশ করেন। তাহারও মূল্য আছে।

(১০) Gladwin's *Reign of Jahangir*, vol. I, Calcutta, 1788,

জহাঙ্গীরের রাজত্বের একখানি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস। এই পুস্তকে প্রদত্ত ঘটনার তারিখগুলি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায়। ইহা মুতমদ্ খাঁর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদমাত্র।

(১১) Dow's *Indostan*, (3 vols.)

ইহা কোন সমসাময়িক ফার্সী গ্রন্থের সাহায্যে রচিত নহে; অধিকাংশ স্থলই কাল্পনিক সুরঞ্জিত কাহিনীতে পূর্ণ, সুতরাং বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অভিমত

শ্রীযদুনাথ সরকার:—"এই গ্রন্থখানিতে রাজিয়া ও নূরজহানের সম্পূর্ণ ও সত্য ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে।... সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্যগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার করিয়া কেবলমাত্র সেই উপাদানের সাহায্যে ব্রজেন্দ্রনাথ ইঁহাদের চরিত্র ও জীবন-কাহিনী আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি অসত্যের, মন-গড়া প্রবাদের আপাতমধুর কাহিনী নির্ম্মমভাবে ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এই কঠোর ইতিহাস-সাধনার ফল বেশ মনোরম হইয়াছে। সত্য রাজিয়া ও নূরজহান্ এই সত্য-সেবীর গ্রন্থে আমাদের নিকট থিয়েটরী রাজিয়া ও নূরজহান্ অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ও মনোযোগ আকর্ষণ করে। এটা বঙ্গভাষার কম গৌরব নহে যে, নূরজহানের সম্পূর্ণ ও ইতিহাস-সঙ্গত জীবনী প্রথমে এই ভাষাতে লিখিত হইয়াছে।...এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ হওয়া আবশ্যক।" ('প্রবাসী,' ভাদ্র ১৩৩০)

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়:—"অল্প পরিসরের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ করা কঠিন হইলেও, লেখক সেই কঠিন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া, রচনা-ক্ষমতার যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা প্রশংসালাভের যোগ্য।" ('ভারতী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)